নশীপুরের নকীব

(উপন্যাস)

শক্তিপদ রাজগুরু

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

NASHIPURER NAKEEB

A novel by

Shaktipada Rajguru

প্রকাশক :
অভয় কুমার ঘোষ
অভয় প্রকাশনী
৭/১/সি, সি-কে, রায় লেন
কলিকাতা-৩৬

প্রকাশকাল :
মহালয়া, ১৩৬৮

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রক :
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
১৪/১, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৬

শ্রীকল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রীতিভাজনেষু—

লেখকের অন্যান্য বই :

মেঘে ঢাকা তারা

অনুসন্ধান

নয়া বসত (চলচ্চিত্রে : অমানুষ)

মায়া দিগন্ত

উষা দিশা হারা

স্বর্ণ মৃগয়া

উত্তরের পাখী

খুনী বেগম্

প্রভৃতি···

গেণু দাস ধমকে ওঠে—ব্যাটা হাঁ করে চেয়ে আছিস কি? হিসেবটা বুঝলি না?

অবিনাশ উবু হয়ে মালিকের সামনে বসেছিল, একা অবিনাশই নয়, চর নশীপুরের আরও দু'চারজন চাষী এসেছে, তারাও হিসেবটা শুনে বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। তারা চলে সোজা হিসেবে। কিন্তু গেণু দাসের হিসেবের ধারাটা ঠিক সেই পথে চলে না। বাকী ধানের বর্তমান বাজারদরে দাম ফেলে ও চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ কষে লোকটা আর তাতে ঋণের অঙ্কটা ফড়িং-এর মত লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ে ওঠে।

নিতাই বলে ওঠে—আজ্ঞে, ফি বছরই ধান আদায় দিচ্ছি, তবু ট্যাকাতো কমে নি। তাহলে আদায়গুলান গেল কুন্‌দিকে আজ্ঞা দাস মশাই?

গেণু দাস কিছু বলার আগেই গোমস্তা গিরিজা পাল বলে ওঠে:

—হিসেবের কড়ি। কি হে অবিনাশ, তুমি তো দু'পাতা পড়েছো, ও গণ্ডমুরুক্ষুটাকে একটু বুঝিয়ে দাও।

একটু দম নিয়ে বলে গিরিজা পাল—না হয় তোমাদের ওই প্রভাত মাস্টারকেই বলো, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদটা ওই কষে দেবে। দেখবে ভুলভ্রান্তি নাই।

জনতার মাঝে গুঞ্জরণটা দেখেছে গেণু দাস। ওই লোকগুলোর মুখ-চোখের চাপা রাগটাকে সে চেনে। আর তাদেরও গেণু দাসকে দরকার। তাই মুখের উপর প্রতিবাদ না করলেও ওরা ক্ষুব্ধ হয়েই বসে—না আজ্ঞে, বাবু বলেছেন ঠিকই আছে।

গেণু দাস চুপ করে সিগ্রেট টানছে। একটু চুপ করে থেকে বলে:

—কিন্তু এবার কোন জমিতে আর ভাগচাষী রাখবো না অবিনাশ।

অবিনাশ চমকে ওঠে। গেণু দাসের ভাগচাষী অবশ্য অনেকেই আছে। সারা চাকলার সরেশ জমিগুলো কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রবলে গেণু দাস নিজের কব্জায় এনেছে। দূর-দূরান্তরের গ্রামের মাঠেও বহু জমি স্বনামে-বেনামে রয়েছে গেণু দাসের।

আর গেণু দাসও জানে কি করে বিষয় রাখতে হয়, বাড়াতে হয়। তাই জমিদারী চলে যাবার সময় নশীপুর-হাবিবপুরের চৌধুরীবাবুদের দে-গাঁয়ের দত্তরায় বাবুদের জমিদারীর বহু জমি তখন নানাভাবে কুড়িয়ে নিয়ে ভাই-ভাইপো-জামাই-মেয়েদের বেনামীতে রেখেছে। জমির আয় ছাড়াও এখন গেণু দাস সুরু করেছে কণ্ট্রাকটারী।

রাস্তা ছাড়াও ছোট-বড় অনেক রিজার্ভার, বাঁধ, সেচের ক্যানেল এসব কাজ হচ্ছে, লাখ লাখ টাকার কাজ। গেণু দাস এখন ব্যবসায় নেমে সেই পথটাকেই চিনে ফেলেছে। তবু গ্রামের সম্পর্কটা বজায় রেখেছে।

এই তার উন্নতির মূল, এই তার শোষণের সাম্রাজ্য। গেণু দাস এখন গাছেরও খায়, তলার ফলও কুড়িয়ে চলেছে। তাছাড়া গেণু দাস ক'বছরে বুঝেছে ওই কণ্ট্রাকটারীর লেবার-টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডদের নিয়ে কাজ করে কিছু বেশী লাভ মেলে সত্যি, কিন্তু তাদের নিয়ে কাজ করার ঝামেলাও কম নয়, তারা কাজ বন্ধ করতে পারে। ইউনিয়নও করে। দাবী জানায়—চাপ দিয়ে সেই দাবী আদায়ও করে নিতে পারে।

কিন্তু এই গ্রামের মানুষদের কাছে সে-সব তেমন কিছু নেই, এদের প্রতিবাদটা ফুটে ওঠে চোখের অসহায় চাহনিতে। মুখফুটে বেশী কিছু বলতে পারে না। এরা মাটির কাছাকাছি থেকে মাটির মতই সর্বংসহা হয়ে উঠেছে।

তবু আজ অবিনাশ—এই নকড়ি—দেপুরের বসন্ত ডোমের মুখ-চোখে দেখেছে গেণু দাস একটা প্রতিবাদের কাঠিন্য। মুখে সেটা আজ প্রকাশ না করলেও মনে হয় কোনদিন এবার সোচ্চার হয়ে উঠবে তারা।

বেলা হয়েছে। চাষীদের অনেকেই দূর-দূরান্তরে থাকে। তারাও উঠেছে। অবিনাশ তবু বলে—ওই ভাগচাষীর কথাটা কি বললেন বাবু?

হাসে গেণু দাস। ওরা যে ভয় পেয়েছে, সেটা বুঝেছে গেণু

দাস। তাই বলে সে—ও নিয়ে পরে কথা বলবো। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে বাপু ভাগচাষী বলে কোনদিন আবার রেকর্ড করাবে, না হয় জে-এল-আর অফিসে গিয়ে দরখাস্ত দেবে কেউ, তাই ভাবছি গাঁয়ে গাঁয়ে জোত করে গরু-লাঙ্গল রেখে নিজের হেপাজতেই চাষ করাতে না হয়। বর্গাদার বসিয়ে লাভ কি?

চমকে উঠেছে ওরা এই কথায়। ওদের নিজেদের জমিজারাত তেমন নেই। তবু গেনু দাস—গ্রামের আর সকলের জমি নিয়েই ওরা চাষ-বাস করে, খোরাকী ধানও কিছু মেলে বর্ষার সময়, আর ধান উঠলে দেনা শোধ করে দিতে হয়। তবু বেঁচে থাকে তারা ওইভাবেই। হঠাৎ সেই জমিগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা কিভাবে বাঁচবে জানে না। মদন গরাই বলে ওঠে:

—ইকি বলছেন দাসমশাই? জমি আপনার—আমরা চাষ করি, লিখিয়ে নোব নিজের নামে?

হাসে গেনু দাস—না, তুমি তা নেবে না। কিন্তু তেমন লোকেরও অভাব নেই হে! অবশ্য আইন যা বলবে তাই হবে। যাক্ পরে ওসব কথা ভাবা যাবে। এখন এসো—বেলা হয়ে গেল।

গেণু দাস চুপ করে বসে আছে।

ক' বছরেই গেণু দাস এখন চড়চড় করে ঠেলে উঠেছে। ওর ভাগ্যের চাকাটা কোথাও বাধা পায়নি। অবশ্য তার জন্য গেণু দাসকে কম মেহনত করতে হয়নি। অনেক আট-ঘাট বেঁধে চলতে হয় আজকের দিনে।

গেণু দাস সেই পথটা চিনেছে। তাই আজ শুধু বিরাট জোত-দারই নয় সে, ধাপে ধাপে কন্‌ট্রাক্টারদের প্রথম সারিতেই উঠেছে সে এ জেলার মধ্যে।

বিরাট বাড়ি করেছে সহরে।

আর গ্রামের বাড়িটাকে যেন ছোটখাটো দুর্গে পরিণত করেছে সে। এদিকে বিরাট খামার বাড়িতে খানকয়েক ট্রাক, জীপ, একটা ট্রাক্টারও রয়েছে। ওদিকে সারবন্দী গোয়াল ঘরে বিরাট বিরাট

বলদ, জারসী, হলস্টেন গরুর দল, একপাশে একটা শেডে বেশ কিছু লেগহর্ণ-রোড আইল্যাণ্ড মুরগীর পালও রয়েছে।

তাছাড়া গড়ে উঠেছে রেস্ট হাউস।

গেণু দাস-এর এখন ওটার দরকার। বাইরের মাননীয় অতিথিরা আসেন, তাছাড়া আসে কেতুলাল, এখানের নামকরা নেতা। সদরের নামী দামী অফিসার—মায় মন্ত্রীদের কেউ এদিকে সফরে এলে এখানেই গেনু দাসের পল্লীকুঞ্জে বিশ্রাম নেন। তাই গেণু দাস ওই রেস্ট হাউসটাকে মনের মত করে সাজিয়েছে, বাগানও করেছে চমৎকার।

সব মিলিয়ে গেণু দাস নশীপুরকে সাজিয়ে তুলেছে। বড় রাস্তা থেকে একটা পথ ছিল আগে গ্রামে, কাছিমের পিঠের মত উঠে যাওয়া পথটার ওদিকে লালমাটির বুকে শালবনের সুরু। এদিকে পথটা এসেছে সবুজ মাঠের দিকে, সামনে একটা নদীর বিস্তার, বেশ কিছুটা রূপোলী বালি ছড়িয়ে নদীটা জলের রেখা হয়ে চলে গিয়ে দামোদরে মিশেছে, নদীর উপরেই চড়াই-এর মাথায় নশীপুর। ছোট্ট একটু বসত।

ওদিকে নদীর ধারে বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর. ওসব ছিল সরকারী জমি, কিভাবে সমবায় সমিতির নামে সেই এলাকা দখল করে ট্রাক্টার নামিয়ে এখন সবুজ আখের খেতে পরিণত করেছে গেণু দাস, —আখ, আলু, বিস্তীর্ণ মাঠে গম, সবই চাষ করে। জলের অভাব নেই। নদীটার বুকে ডিপটিউবওয়েল, লিফ্‌ট পাম্প সবই করেছে গেণু দাস, আর বিজলীও এনেছে গ্রামে।

তাই এই চাকলার লোকে গেণু দাসকে বলে কর্মবীর।

গেণু দাস আজ ওই পঞ্চগ্রামের চাষীদের চোখের চাহনিটায় কেমন একটা জ্বালা ফুটে উঠতে দেখে নিজের মনের রাগটা চেপে গেছে। অবশ্য রেগে উঠলেও গেণু দাস কখনও চীৎকার করে সেটাকে প্রকাশ করে না। বেশ হাসি হাসি মুখ করেই থাকতে পারে সে সব ক্ষেত্রে। অবশ্য খুবই কঠিন কাজ এটা, কিন্তু গেণু দাসের স্বভাবের সঙ্গে এই কৌশলটা মিশে আছে। বলে গেণু দাস।

—ওই প্রভাত মাস্টার তাহলে বুদ্ধি মতলব দিচ্ছে নাকি হে গিরিজা ?

গিরিজা গোমস্তাই গেণু দাসের এখানের প্রাইভেট সেক্রেটারী কাম ম্যানেজার।

গিরিজা গেণু বাবুর কথায় জাবেদা খাতা লেখা বন্ধ করে শোনায়—তাই তো মনে হয় দাসজী। ছোকরা ওদের গ্রামে গ্রামেও যায়, শুনেছি হাটতলায় সেবার নদীর বাঁধ বাঁধানো নিয়ে লেকচারও দিয়েছে।

—হুঁ! কথাটা ভাবছে গেণু দাস।

—তা স্কুলের কাজকর্মও তো ভালই করে শুনেছি।

গেণু দাসের কথায় গিরিজা এবার ইতিউতি করে বলে :

—আজ্ঞে সবাই তো কমবেশী ওই পথেরই। একা হেডমাস্টার মশাই কতো সামলাবেন। বাইরের বাবুদের মাস্টারী দিলেন ভালো পড়াবে বলে। তা ওনারাই তো এখানের লোকগুলোকেও পাখী পড়ানো করে ওই সব শেখাচ্ছেন! কৃষক সমিতি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নামে ভূতের কেত্তন হচ্ছে এখানে।

গেণু দাস চুপ করে কথাটা শুনছে। কি ভেবে বলে :

—গিরিজা, একবার অধরবাবুকে খবর দিও। সন্ধ্যায় যেন আসেন।

রাতের বেলায় স্তব্ধতা নেমেছে গ্রামে। ওদিকে আমবাগানের ধারে টানা ইস্কুল বাড়িটা আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যায়, যেন একটা বিরাট প্রাণী নাক তুলে লম্বালম্বি শুয়ে আছে। ওদিকে স্কুল বোর্ডি-এর ঘরে দু-একটা আলো জ্বলছে।

গেণু দাস বাবার নামে ইস্কুলটার জন্য দশ বিঘে জমি দিয়েছিল, আর ওর ঠিকেদারী ব্যবসার সুরু এইখান থেকেই। কেতুলালও তখন তাকে যথেষ্ট মদত দিয়েছিল, অবশ্য গেণু দাসই তৈরী করেছিল কেতুলালকে।

কেতুলাল-এর ভালো নামটা এ-অঞ্চলের অনেকেই জানে না। তখন নশীপুরের ওই আমবাগানে একটা মাটির চালাঘর ছিল, প্রাথমিক স্কুল বলা হোত। দরজা জানলার বালাই নেই, আর অধরের বাবা ভূধর ভটচায ছিল পাঠশালার হেড পণ্ডিত।

গেণু দাস তখন ওখানের ছাত্র, আর কার্তিককুমার লাল ছিল শিরপড়ুয়াদের অন্যতম। পাশ করে স্কুল বের হয়ে যাবার লক্ষণ ওর নেই, কার্তিক-এর নামকরণ করেছিলেন ভূধর পণ্ডিত—কেতু! আর গেণু দাস-এর নামকরণ করেছিলেন রাহু। দুটিতে যেন মাণিকজোড়। গ্রামের যত নষ্টামিদুষ্টুমির মূলে ছিল ওরা যুগলে।

পরে গেণু দাস অবশ্য বাবার জমি-জায়গা দেখাশোনার সঙ্গে ব্যবসাও সুরু করে। রাহু যেমন চন্দ্রকেও গ্রাস করে, ওই গেণু দাস ক্রমশ ভূধর পণ্ডিতের কথাটার সত্যতা প্রমাণ করেছিল, এ চাকলার সবকিছুকে গ্রাস করেছিল। আর কেতু কক্ষচ্যুত দুষ্ট গ্রহের মত ঘুরে বেড়াতে থাকে।

কেতুর মুখে অমায়িক হাসি, সেবার নদীর বানে এই এলাকার বহু জমি গ্রাম ভেসে গেছে। বানের জলে সবুজ ধানক্ষেত হেজে গেছে, হঠাৎ দেখা যায় কেতুলালকে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষকে সে জাগিয়ে তুলেছে, শিবু ডোমকে ধরে ঢোল-সহরৎ করে হাটতলার মিটিং-এর খবরও ছড়িয়ে দিল। ফলে কাতারে কাতারে লোক জমেছে, কেতুলাল উত্তেজিত ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তাদের দাবী আদায়ের জন্য তৈরী করে।

পরদিনই এই এলাকার মানুষকে নিয়ে দল বেঁধে পনের মাইল দূরে সদর সহরে গিয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো ঘেরাও করলো! সহরের পথে পথে চলে ওদের বিরাট শোভাযাত্রা, কয়েকটা সাপ্তাহিক মফস্বল বার্তায় নাম বের হল কেতুলালের। আর রিলিফ-এর আশ্বাসও এসে গেল।

গেণু দাসও দলে ভিড়েছে, অবশ্য কার্তিকই নেতা। চাল, গম,

ধুতি-কম্বলও বেশকিছু এল। গেণু দাস হল সেক্রেটারী, কার্তিক হল প্রেসিডেন্ট। এ অঞ্চলের মানুষের দরদে তারা ভেঙ্গে পড়লো। কার্তিক তখন থেকেই নেতা সেজে গেল।

গেণু দাস অবশ্য বন্যার্তদের রিলিফ দিয়ে সেবার জীপটা কিনেছিল। কারণ দেশসেবার কাজে ওকে ঘুরতে হবে কার্তিককে নিয়ে।

কেতুলালকে সেই থেকেই গেণু দাসই দেখে আসছে। কেতুলাল অবশ্য প্রকাশ্যে হাটতলার মিটিং-এ সেবার জোর গলায় ঘোষণা করে —শোষণকারীদের আমরা বাধা দেবই। আর গেণুবাবুকেও জানিয়ে দিতে চাই—বন্ধু বলে তাকেও ক্ষমা করা হবে না। তার গোলার ধান দেশের মানুষের অভাবের সময় দিতেই হবে। না দিলে সেই ধানের পাহাড় কি করে ছিনিয়ে নিতে হয়, তা আমরা জানি।

হাততালির শব্দে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে। সমবেত জনতা বাহবা দেয়।

—কার্তিকবাবুর হিম্মত আছে হে। বাপের ব্যাটা। গেণুদাসকে ছেড়ে কথা বল্লে না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অবশ্য কেতুলালের অন্য মূর্তি। তখনও গেণু দাসের বাগান-বাড়ি ওই গেস্ট হাউস হয়নি। ওর বাড়ির ওদিকের ঘরে কষা মাংসের টুকরো চিবুতে চিবুতে কেতু বলে ঃ

—মিটিং-এ এসব না বললে, তে'মার তিন হাজার মণ ধান লুঠ হয়ে যেতো না দাসমশাই? ওরা তো তৈরী হয়েছিল।

হাসছে গেণু দাস। ও খবর পেয়েছিল। কারণ দু'বছর খরা অজন্মা চলেছে। ওর খামারে সারবন্দী ধানের গোলার ধানগুলো পাচার করতে পারেনি তখনও। গুপীপুরের চট্টরাজদের চারটে ধানের গোলা লুঠ হয়ে গেছে শিবপুরের ভক্তি ঘোষের খামারেরও ধান কেড়ে নিয়েছে বুভুক্ষু মানুষের দল। এখানেও সেই ঘটনা ঘটতে চলেছিল, কার্তিক তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য পরদিনই গেণু দাস-এর খামারে ঘটা করে ধানের মরাই ভেঙ্গে কেতুলাল দাঁড়িয়ে থেকে এই অঞ্চলের কিছু বিশেষ লোককে ধান কর্জ দেওয়া করালো, ধন্য ধন্য পড়ে গেল কেতুলালের নামে। কেউ আবার জয়ধ্বনি দেয় ঃ

—পল্লীমঙ্গল সমিতি জিন্দাবাদ। কেতুলাল জিন্দাবাদ।

রাতের অন্ধকারে বড় রাস্তা ধরে কয়েকখানা ট্রাক বার কয়েক ক্ষেপ দিয়ে প্রচুর ধান ততক্ষণে গেণু দাসের ধানকলে পাচার করে দিয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ধান।

গেণু দাস এমনি করে নিজের স্বার্থেই কেতু'লালকে গড়ে তুলেছে। সেই লক্ষ্মীছাড়া কেতুলালকে সেবার গেণু দাসই ভোটে দাঁড় করায়। গেণু দাসের তখন রমরমা অবস্থা। সহরেও ধানকল তেলকল চালু হয়েছে। আর ইতিমধ্যে স্কুল বাড়ির জন্য কেতুলালই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে জনসভার মাধ্যমে শিক্ষার মহিমা প্রচার করেছে।

সবচেয়ে অবাক হন ভূধর পণ্ডিত। বৃদ্ধ হয়েছেন—সেদিন কেতুলালকে জীপ থেকে নেমে হাটতলার মিটিংএ বক্তৃতা করতে দেখে এগিয়ে যান। কেতুলাল উদাত্তস্বরে বলে চলেছে ঃ

—এই এলাকায় উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান গড়তে চাই। আমরা আমাদের এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে ছিনিয়ে আনতে চাই। তাই আপনাদের যার যা সামর্থ্য তাই দিয়ে সাহায্য করুন। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন—সেই সাহায্যই আমাদের হাত শক্তিশালী করে তুলবে। আমাদের ছেলেরা যাচ্ছে—

ইতিমধ্যে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ছেলেরা বের হয়েছে।

—এ্যাই কেতো!

ডাক শুনে কেতু দাঁড়াল,—পণ্ডিত মশাই।

কার্তিক অবশ্য ঠাট-ঠমকগুলো পুরো মেনে চলে। ভূধর পণ্ডিত অবাক হয়েছিল কেতোকে হঠাৎ শিক্ষা নিয়ে লেকচার দিতে দেখে। ও নাকি এখন সারা এলাকায় লেকচারও দেয়। অথচ কেতোকে

সাত বছর পিটিয়ে তিনি প্রাইমারী পাশ করাতে পারেন নি। সেই কেতোকে আজ শিক্ষা নিয়ে বাক্য রচনা লেখা নয়—বহুবচন দিতে দেখে মনে হয়েছিল তাঁর—এবার একটা সর্বনাশ কিছু ঘটতে চলেছে। ভূধর পণ্ডিত বলেন :

—সাত বছর গড়িয়েও সন্ধি-সমাস আর সুদকষা-লঘুকরণ শিখলি না—আজ হঠাৎ স্কুলের জন্য এতো ভক্তি কেন র‍্যা ?

পণ্ডিতগুলোই এমনি আকাট, তা কেতু এর মধ্যেই জেনে ফেলেছে। তবু কেতুলাল ওই জনতার মধ্যেই পণ্ডিত মশাই-এর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁর ফাটা পায়ের এক-খামচা ধুলো তুলে নিয়ে গদগদ স্বরে বলে—আশীর্বাদ করুন পণ্ডিত মশাই, এখানে যেন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হই।

···স্কুল বাড়ির ব্লু-প্রিণ্ট, প্ল্যান সব হয়ে গেছে। গেণু দাসের ওই জমিতে দোতলা স্কুল, সায়েন্স ব্লক, হ'ল, বোর্ডিং ইত্যাদি হচ্ছে। কিছু টাকা উঠেছে আর কিছু দিয়েছে গেণু দাস। কাজও সুরু হয়েছে। কেতুলাল এর মধ্যে সহরের মাতব্বরদের, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেকটার মায় শিক্ষামন্ত্রীকে কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে এলাহি কাণ্ড করেছে উদ্বোধনের সময়।

আর স্কুল বাড়ির জন্য এসে গেছে লক্ষাধিক টাকা।

গেণু দাস সেক্রেটারী, কেতুলাল প্রেসিডেণ্ট। গেণু দাসই বাড়ি তৈরীর ভারটা দয়া করে নেয়। পঞ্চগ্রামের লোকদের সভায় সেদিন ঘটা করে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কেতুলালের অনুরোধে গেণু দাস ওই ভার নিতে রাজী হয়।

অবশ্য তারপর দফায় দফায় সরকারী অনুদান এসেছে, গেণু দাসও কাজ করে চলেছে। তিন বছরের কঠিন সাধনায় আর দুস্তর আত্মত্যাগে সেদিন ওই স্কুল, সায়েন্স-ব্লক, বোর্ডিং, পুকুর এসব গড়ে ওঠে।

সারা এলাকার লোক ধন্য ধন্য করে।

বদন ডাক্তার হাটতলায় তার ডিসপেনসারীতে পঞ্চগ্রামের

রোগীদের সামনে ঘোষণা করে : কেতুলাল বাপের ব্যাটা হে, গেণু দাস তো কসাই, লোকের সব লুটে নিত, পারেনি শুধু কেতুলালের জন্য। উল্টে তাকে স্কুলের জন্য বেশ কিছু টাকা ও জমি দিতে হয়েছে।

সকলেই একবাক্যে কথাটা স্বীকার করে। কেতুলাল হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের একনিষ্ঠ দেশসেবক।

অবশ্য গেণু দাস এবার সদরের কোন সাহেবকে তার স্কুল বাড়ির কাজ দেখিয়ে কোনা নদীর বিরাট জলাধারের বেশ কিছু কণ্ট্রাক্টও পেয়ে গেছে। আর তার জন্য মূলধন ঘর থেকে বের করতে হয়নি। স্কুলের বিল্ডিং তৈরীর থেকেই বেশ কিছু টাকা সরিয়েছিল, আর বাড়তি ইট-মশলা দিয়ে স্কুলের রাস্তা, গ্রামের রাস্তা করিয়ে দিয়েছে কেতুলালকে দিয়ে।

ভূধর পণ্ডিতের নাম দেওয়া রাহুকেতুর গ্রাসটা এমনি করেই কায়েম হয়ে বসেছিল ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের বুকে অন্যরূপে। সেইটাকে কায়েম করেছে কৌশলী গেণু দাস ওই কেতুলালকে ভোটে জিতিয়ে।

কেতুলাল প্রথমে কথাটা শুনে চমকে ওঠে :

—ভোটে দাঁড়াবো কিহে গেণু ? শেষকালে হেরে গেলে বেইজ্জত হবো। তার চেয়ে এই ভালো।

কেতুলাল অবশ্য মাসে মাসে তখন গেণু দাসের কাছ থেকে একটা টাকা পায়। সেটার খবর আর কেউ জানে না। ওই স্কুলের বাঁচানো টাকা, সেবার পঞ্চাশ হাজার টাকার ধান বেচার কিছু কমিশন, সহরের ধানকল তৈরীর সময় পারমিটের কয়েকশো টন সিমেণ্ট কালোবাজারে বেচে দিয়েছিল ইত্যাদি। নানা কাজের বাবদ গেণু দাসের কাছে তার কিছু টাকা রয়ে গেছে। সে টাকা গেণু দাস ব্যবসায় খাটিয়ে ওকে মাসে মাসে সুদটা দেয়। কেতুলাল অবশ্য একটা ঘর-বাড়ি করতে চেয়েছিল। গেণু দাস বলে :

—এ পথে ওসব চোখটাটানো কিছু করতে নেই কেতো। যত

গরীব সেজে থাকবি, তত সুবিধে হবে আখের গুছিয়ে নিতে। আর ঘর-বাড়ির ভাবনা কি ? এইখানেই থাকবি।

কেতুলালও বুঝেছিল কথাটা।

এবার গেণু দাসের কথায় তবু অবাক হয়। গেণু দাস দেখেছে জেলায় রাজনীতির গণ্ডী ছাড়িয়ে তার হাতটা বাড়াতে হবে বৃহত্তর পরিবেশে, আর সারা জেলায় আধিপত্য বিস্তার করা দরকার। ধাপে ধাপে সে উপরে উঠছে। এবার সরকার চাষ, নদীবাঁধ, রাস্তাঘাট-এর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে, তার বেশ কিছুটা ওকে পেতেই হবে। তাই ধাপে ধাপে এগোতে চায় গেণু দাস।

এখানের নেতা কিশোরলালজী সদরের লোক, দেখেছে গেণু দাস কিশোরলালের ভাইপো কেমন করে ঠেলে উঠেছে। তবে গেণু দাস কিশোরলালের কাছে কোন সাহায্যই পায়নি, বরং বাধাই পেয়েছে, ওই ঠিকেদারীর দু' একটা কাজ হাত ফসকে কিশোরলালের লোকেদের কাছেই চলে গেছে।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেবই সেদিন বলেন গেণু দাসকে :

—জানেন তো ব্যাপার-স্যাপার। ওদের জন্য নেতারাই রেকমেণ্ড করেছেন। ওদের তো চটাতে পারি না। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা মুশকিল।

কথাটা বুঝেছে গেণু দাস। তাই এবার সে বড়ের চালই দিতে চায় ওই কেতুলালকে দিয়ে। ওকেই নেতা বানাবে সে।

গেণু দাস বলে—আর ভয় পাচ্ছিস কেন কেতু ? আমি তো পিছনে রয়েছি।

কেতুলালের অসুবিধা অন্যত্র। ভোটে জিতলেই নানা ঝামেলা। কলকাতা যেতে হবে। সেখানে তার বিদ্যের দৌড়টাও ধরা পড়ে যাবে। কিশোরীবাবু লেখাপড়া জানা লোক সে সামলাতে পারে, কিন্তু কেতুলাল জানে তার দৌড় কতদূর। তাই এড়াবার জন্য বলে কেতুলাল :

—অনেক খরচাপাতির ব্যাপার।

হাসে গেণু দাস—তোর সে ভাবনা নেই।

—কিন্তু কলকাতায় গেলে যে বিদ্যেবুদ্ধি ফাঁস হয়ে যাবে রে? কেতু জানায়।

গেণু দাস এর মধ্যে দেখেছে অনেক কিছু। সে বলে ওঠে:

—যা শিখেছিস ভূধর পণ্ডিতের পাঠশালে, ওই দিয়ে হবে, আর দু-চারটে ইংরেজী বুলি শিখে নিবি। ব্যস। ওই ইস্কুল-কলেজের বিদ্যে নিয়ে মাসে দুশো টাকার কেরাণী তৈরী হয় মাত্তর। ছাড় তো ওসব বাতেলা। নেমে পড় দুর্গা বলে।

…কেতুলাল সারা এলাকায় এবার নোতুনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। দরিদ্রের বন্ধু, সারা অঞ্চলের মানুষের দুঃখের কথা জানাবার ব্রত নিয়েছে সে। ভোটের সময় অবশ্য তার টাকার অভাব হয়নি, কোন একটা দলের নেতাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে গেণু দাসই তার মনোনয়ন এনে দিয়েছে। আর কটা জীপ-ট্রাক-এ লোকজন দিনরাত ধূলো উড়িয়ে ঘুরছে, কেতুলাল ঘুরছে চরকির মত।

কয়েকদিনের মধ্যেই নশীপুর অঞ্চল ছাড়িয়ে আশপাশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে কেতুলালের নাম। তাই বিভিন্ন হাটতলার গাছ—এখান ওখানের দোকানে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কেতুলালের নামের পোষ্টারগুলো দড়িতে বেঁধে লটকানো হয়ে যায়।

গ্রাম গ্রামান্তরের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে চীৎকার আর শ্লোগানে।

—ভোট ফর কেতুলাল।

ছেলেবুড়ো এমনকি মেয়েরা অবধি চীৎকার করে গ্রামের পথে।

—কেতুলালকে ভোট দিন।

গেনু দাস-এর হিসেবে ভুল বড় একটা হয় না। ওই কর্মকাণ্ডের পিছনে রয়েছে সে নিজে। জীপে করে ঘুরছে সে। আর ওসব গ্রামের অনেক মানুষের টিকি বাঁধা তার কাছে। ধান দাদন, দেনার টাকার

জালে তারা বাঁধা আছে। সুতরাং গেনু দাসকে চটাবার সাহস তাদের নেই।

গেনু দাসের প্রতিপক্ষ কিশোরীবাবু বাইরের লোক। এখানের কিছু লোক তাকে চেনে জানে। তারা অবশ্য ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া তোলার চেষ্টা করে মাত্র।

কিন্তু গেনু দাস-এর হাতটা অনেক শক্ত। ইস্কুলের কর্তা সে। ফ্রি-শিপ, হাফ-ফ্রি-শিপ দিয়েও অনেককে হাতে এনেছে। আর ইলেকশনের অফিস সামলাচ্ছে তারই স্কুলের হেড-মাস্টার অধর ভটচায।

সব মিলিয়ে কেতুলালের ক্যাম্প জমজমাট। প্রতি হাটে ভলেন-টিয়ারদের জন্য গেনু দাস চা-জলখাবারের ব্যবস্থা রেখেছে। তাই দলে দলে কর্মীও জুটে গেছে।

ভোটের দিনই বোঝা যায় হাওয়া কোনদিকে।

কেতুলালও হাত জোড় করে বিনীতভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। গেনু দাস বলে—ঘাবড়াবিনা কেতো।

কেতুলালও বুকে ভরসা পেয়েছে। গেনু দাসই তার জন্য এতসব করেছে। কেতুলাল বলে ঃ

—না দাদা, তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি! তোমার ভরসাতেই তো নেমেছি।

গেনু দাস বলে—ভরসা রাখবি, ঠকবি না।

আর ঠকেনি কেতুলাল। গেনু দাসও মিছে কথা বলে নি। ভোটের ফল বের হতে কেতুলালও চমকে ওঠে।

গেণু দাস ওকে আবীর মাখিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। কেতুলালের এই দিগ্বিজয়ের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সারা গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। বাদ্যভাণ্ড চলেছে।

ভূধর পণ্ডিত এই চাকলার সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞান। স্পষ্টবাদী নির্ভীক ব্রাহ্মণ। একমাত্র এই গেণু দাস

তাকে কিছু জমি দিয়ে তার বাড়িতে বিগ্রহ পূজার জন্য আসতে বলেছিল। কিন্তু ভূধর পণ্ডিত তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আজ ভূধর পণ্ডিত অসুস্থ। একমাত্র সন্তান অধর অবশ্য এম-এ পাশ করে গ্রামে আসতে এই গেনু দাসই তাকে বলে ঃ

—গ্রামের ইস্কুলটা তুমিই দেখো অধর।

অধরও ভেবেছিল কথাটা। বাইরে চাকরীর যা বাজার তাতে খুব সুবিধা হবে না। তবু গ্রামে বসে পাঁচ ছ'শো টাকা অনেক। আর সম্মানের কাজ। তাই সে রাজী হয়ে গেছল।

কথাটা শুনে পণ্ডিত মশাই খুশী হননি। বলেন তিনি ঃ

—একি করলে অধর? এই গেণু দাসের তাঁবে চাকরী না করলেই ভালো হতো।

অধর সদ্য পাশ করে এসেছে। এই চাকরী নিয়ে কোথায় ভুল করেছে জানে না সে।

তাই বলে—খারাপ কি হলো বাবা এ চাকরী নিয়ে!

ভূধর পণ্ডিত ছেলের দিকে চাইলেন।

ওরা চেনেনা ওই লোকগুলোর প্রকৃত স্বরূপ।

অধর ভটচায-এর মনে হয়, বাবা সেকেলে লোক, এ কালের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তাই বলে সে ঃ

—দিন বদলেছে বাবা।

ভূধর পণ্ডিত ধমকে ওঠেন থাম তুই, এম-এ পাশ করে একটা গাড়োল হইছিস। না হলে কেতুলাল গেনু দাসের দলে যাস।

আরও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি, তাঁর ছেলেকে ওই ভোটের সময় গেনুদাস-কেতুলালের হয়ে কাজ করতে দেখে। দিন সত্যিই বদলেছে, তাই কিশোরীবাবুর মত লোককে বাদ দিয়ে আজ তারা কেতুলালের মত অপদার্থ লোককে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

আরও বিস্মিত হয়েছিলেন পণ্ডিত, সেই কেতুলালকে জয়ী হয়ে ঘটা করে বাদ্যি বাজিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করতে দেখে। মনে হয়েছিল বৃদ্ধের, দিন সত্যিই বদলেছে। তবে এর পরে আরও কি হবে

তা জানেন না। চুপ করে দেখেছিলেন ব্যাপারটা, নিজের ছেলেকেও কিছু আর বলেন নি। দেখছিলেন ওই শোভাযাত্রায় অধরও রয়েছে। মনে হয় তাঁর, দিন বদলেছে আর মানুষের যোগ্যতা মাপার মাপ-কাঠিটাও আমূল বদলে ফেলেছে এরা। অধরও আজ তাদেরই সমগোত্রীয়। ভূধর পণ্ডিতের চোখের সামনে একটা ছায়া অন্ধকার যেন ঘনিয়ে আসছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই ভূধর পণ্ডিত মারা যান।

গেণু দাস অবশ্য তাঁর কথাগুলো কানা-ঘুষোয় শুনেছিল, শুনেছিল কেতুলালও। কেতুলালের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হবার মত অবস্থা। অধরবাবুই নিজে কেতুলালের সম্বর্ধনাসভা করেছে। পঞ্চগ্রাম, দশ গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। আর কেতুলাল তাদের সামনে অধরবাবুর লিখে দেওয়া বক্তৃতা পড়েছে—হাততালি কুড়িয়েছে।

ভূধর পণ্ডিত সেই দৃশ্য দেখতে আর বেঁচেছিলেন না।

সেই বছর গেণু দাসের পরামর্শে কেতুলাল গার্ল'স্ সেকশন্ খুললো এখানে। নারীজাতির শিক্ষার প্রসারকল্পে তার শিক্ষা বিষয়ক সারগর্ভ আলোচনা ফলাও করে সদরের দেশবার্তা সাপ্তাহিকে ছাপা হয়ে গেল।

অধরবাবুকে তারা গার্লস্ সেকশনের চার্জে রেখে কিছু আমদানীর ব্যবস্থা করে দিতে ভোলে নি, আর গেণু দাস এখন বিরাট ঠিকাদার। বিশ লাখ টাকার রিজার্ভারের ঠিকাটা পাকা ফলের মত তার হাতে এসে পড়েছে, অবশ্য কেতুলাল ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে নিয়ে কলকাতায় গেছল এই ব্যাপারে।

·· ঠাকাটা মসৃণভাবেই চলেছে এতকাল।

কেতুলাল এখন কর্মব্যস্ত মানুষ। জীপে করে ঘোরে। সহরেই আস্তানা করেছে, আর বেনামীতে বাসরুটও নাকি করেছে। কেউ বলে—গেণু দাসের কণ্ট্রাক্টটারী বিজনেসের সেও পার্ট'নার।

কিন্তু গেণু দাস হিসাবী দূরদর্শী লোক। তাই মেঘমুক্ত আকাশে

হঠাৎ কালোমেঘের ছায়াটা আগে থেকেই দেখেছে সে। কিছুদিন থেকে গুজব রটেছে সারা চাকলায়—বিভিন্ন জেলায় জমি নোতুন করে সেটেলমেণ্ট হচ্ছে, আর ভাগচাষীদেরও নাম এবার থেকে রেকর্ড করা হবে।

গেণু দাস, বলরামবাটির হলধর ঘোষ, সোনাগাঁয়ের নিকুঞ্জ সাঁপুই এরা অনেকেই ভাবনায় পড়েছে। নিকুঞ্জ সাঁপুই বলে :

—ভোট দিয়ে জেতালাম আমাদের সর্বনাশ করতে? তাহলে এসবের মানে কি গেণুবাবু?

জমিদারী চলে গেল, বন-জঙ্গল বর্তালো সরকারে। তবু জমি কিছু নানাভাবে সরিয়ে রেখেছিল তারা স্বনামে-বেনামে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো জমিগুলো ভাগচাষীদের দিয়ে চাষ আবাদ করাতো, নিজের জোতে করানো সম্ভব নয়। কিন্তু এবার যদি ওই বর্গাদাররাই রেকর্ডে নাম বসাতে পারে তাহলে তারাই তো গোলমাল বাধাবে।

গেণু তাও শুনেছে কথাটা কেতুলালের কাছে আগেই। কেতুলাল বলে—এসেম্ব্লিতে এ নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। নোতুন করে সেটেলমেণ্ট হবে আবার।

গেণু দাস, হলধর ঘোষ, নিকুঞ্জ সাঁপুইয়ের কথায় জানায় :

—তাই তো শুনছি। দেখা যাক কি হয়।

সাঁপুইমশায় বলে—আমাদের শেষ না করে ছাড়বে না।

সারা এলাকায় ওরাই কয়েকজন বাঁচতে চায় মাটি কামড়ে থেকে, তাই যেন ভাবনায় পড়েছে তারা।

আর গেণু দাসও দেখেছে বিরাট একটা শ্রেণীর চোখে সেই বিক্ষোভের, প্রতিবাদের আগুন। গেণু দাস হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল। রাত্রি নেমেছে। অন্ধকারে কম পাওয়ারের বাল্ব কয়েকটা জ্বলছে বড় উঠোনের আশপাশে। গেণু দাস অধরবাবুকে দেখে চাইল।

—এসো মাস্টার!

অধর ভটচায জানে, কিভাবে কত্তাদের খুশী রাখতে হয়। তার

বাবার আমলের দিন বদলেছে। সেদিনের ভূধর পণ্ডিত আজীবন অভাব আর অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে, অধর তাই সাবধানী হয়ে উঠেছে। গ্রামে বসেই কয়েকশো টাকা মাইনে পায়। আরও এদিক -ওদিকের রোজগার কিছু আছে। জমিজারাতও করেছে অধরবাবু। অধরবাবু নমস্কার জানিয়ে বলে—কাল এসেছেন শুনলাম, স্কুলের কাজে আটকে ছিলাম, আজ অবশ্য সন্ধ্যায় আসবো ঠিক করেছি. তখনই গিরিজাবাবুর লোক গেল! শরীর ভালো তো?

গেণু দাস বলে—চলছে একরকম। ওই প্রভাতবাবু, রবিবাবু এঁরা কাজকম্মো কেমন করছেন? অবশ্য শুনেছি স্কুলের কাজের চেয়ে বাইরের কাজই বেশী করেন ওঁরা। মানে জনসেবা-টেবা--

অধরবাবু সাবধানী লোক। গেণু দাসের কথার সুরে অন্য একটা কিছুর সন্ধান পেয়েছে, অধরবাবু জানে ওদের ব্যাপারটা। তাই বলে—ওঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, এ গ্রাম সে গ্রাম যান।

গেণু দাস একটু কড়া স্বরে বলে ঃ

—আরও লোক ক্ষেপাতে চান--না? ওঁদের বলে দেবেন, বাইরে থেকে এসে এসবের চেষ্টা এখানে যেন না করেন; আপনিও ওঁদের উপর নজর রাখবেন। তাঁরা যদি এইসব করতে থাকেন—আমরাও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

অধরবাবু চুপ করে কথাটা শুনছে, ওঁরও ভাবনা ঢুকেছে। কারণ গেণু দাসকে সে চেনে। কেতুবাবুর চেয়েও অনেক গভীর জলের মাছ উনি। গেণু দাস বলে—ওই গার্লস সেকশনে গীতা রায়ের সঙ্গে ওনার একটু ভাবসাব শুনেছি।

অধরবাবু অবাক হয়! এত খবর কোত্থেকে দাসজীর কানে এসেছে তা ভাবতে পারে না। ভয় হয় তার, এবারের হিসাবে জমার ফাঁকগুলোর কথাই বোধহয় বলে বসবে এবার। অধরবাবু জানায় ঃ

—ওরা নাকি একসঙ্গে পড়তো কলেজে।

গেণু দাস চুপ করে কি ভাবছে। বলে ওঠে—ওঁকে, ওই গীতা রায়কে কাল বৈকালে একবার দেখা করতে বলবেন। আর আপনি

ওঁদের উপর একটু নজর রাখুন। অবিনাশ-এর সঙ্গে শুনেছি প্রভাত-বাবুর চেনাজানা একটু বেশী? ওই অবিনাশ গায়েন—নশীপুরের।

অধরবাবু অবাক হয় খবরগুলো শুনে। অধরবাবু বলে:

—শুনেছি বটে! অবিনাশের ওখানে যায় প্রভাতবাবু।

আজ গেণু দাসের আসল রূপটাকে যেন কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছে অধরবাবু। অন্ধকারে একটা শয়তান তার ধারালো থাবা বের করেছে চরম আঘাত হানতে। আজ বাবার কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধ ভূধর পণ্ডিত বলতেন—চারিদিকে ওদেরই ধারালো নখ-দাঁত-এর কামড় বসবে অধর। দেখে নিস্ আমার কথা মিথ্যে হবে না। রাহু-কেতুর গ্রাসে আকাশের চাঁদও হারিয়ে যাবে, নামবে শুধু অন্ধকার।

অধরবাবু তখন ঠিক ভাবেন নি কথাটা। আজ মনে হয় নিজেকেও ওদেরই চক্রে আবদ্ধ করে ফেলেছে। তার থেকে বের হবার পথ ওর জানা নেই।

দুপুরে অবিনাশ দাসজীর বাড়ি থেকে ফিরছে। সঙ্গে রয়েছে নকড়ি, দে-গাঁয়ের রামাই মোহান্ত, যতিলাল, আরও অনেকে। আজ দাসজীর কথাবার্তাগুলোয় তারা খুশী হয়নি।

যতিলাল বলে:

—শালো ভর্তিগাজনে ঢাক ফাঁসাবে নাকি গ অবুমামা?

অবিনাশ ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। তবু মনে হয় তাদের ভাত-ভিত সব কিছুই জন্মলগ্নে যেন ওই দাসজীর মত মানুষদের হাতেই সমর্পিত হয়েছে।

নকড়ি ফুঁসে ওঠে—জমি কেড়ে লিবেক ভরা বর্ষায়! এতই সস্তা হে!

অবিনাশ জবাব দিল না।

সন্ধ্যা নামছে, কাজলা নদীর চরভূমিতে বিস্তীর্ণ সবুজ আখের খেতে বাতাস সুর তুলেছে, দু-একটা তারা ফুটে ওঠে শান্ত এই

পরিবেশে। অবিনাশের মনে হয় তার জীবনে এই শান্তিটুকুকে উপভোগ করারও কোন অবকাশ নেই।

নকড়ি বলে—তুইও ঠিক থাকিস অবা, আমি সারা অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে কথা বলছি। জমিতে হাত দিতে এলে অনর্থ হয়ে যাবেক—হ্যাঁ।

…টিয়া বৈকালে একটু সাজবেশ করে। আর সাজবেশ করার বয়সই তার। টিয়ার বাবা-দাদারা সদর সহরের লাগোয়া কোন গ্রামের লোক, তাই সহরের ছোঁয়া কিছুটা এসে লেগেছিল সেখানে। টিয়াও ছেলেবেলায় সেখানের পাঠশালায় পড়েছিল। ফ্রক পরে মাথায় ফিতে বেঁধে সেজেগুজে সহরের অন্যান্য মেয়েদের মতই স্কুলে গেছে, বেড়িয়েছে। মাঝে মাঝে দাদার সাইকেল-রিকশায় চেপে সহরের সিনেমায় গেছে।

আর সেই টিয়াকে যে এমনি অজ গ্রামে এসে পড়তে হবে, টিয়া ভাবে নি। প্রথম প্রথম অবিনাশের সংসারে এসে মনমরা হয়ে থাকতো, আড়ালে কান্নাকাটিও করতো। মাঝে মাঝে ওই বেবশ টিয়া বিদ্রোহে মুখর হয়ে উঠতো।

অবিনাশ দেখেছে তাকে, টিয়ার রূপযৌবন যেন সবুজ গ্রামে এসে এখানের সতেজ গাছ-গাছালির মত প্রাণ-সম্পদে টসটসে হয়ে উঠেছে।

তবু অবিনাশ বলে ঃ

—এই গেরামের ঘরই ভালোরে।

টিয়া বলে—ছাই। সাঁঝবেলাতেই রাজ্যির আঁধার নামে, কাদা প্যাচপেচে পথ, সিনেমা নাই—আলো নাই।

হাসতো অবিনাশ—ওসবে দরকার কি? জমিজারাত আছে, খামার, গরু, গোয়াল এসবের হেপাজত কর। গাঁয়ের সকলেই তো এই নিয়েই রয়েছে। তুই কেন থাকতে পারিস না?

টিয়ার ওসবে মন বসে না। মনের অতলের অতৃপ্তিটা ফুটে ওঠে ওর কথায়।

টিয়া বলে—তাও নিজের জমি তো দেনার দায়ে বিক্রমপুর হয়ে গেছে। এখন ওই দাসজীর জমি নিয়ে এত রব্‌রবানি। বলে না—পরের সোনা নিও না কানে, টেনে নেবে হেঁচকা টানে!

অবিনাশ ওর দিকে চাইল। টিয়ার দু'চোখে কি কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। সুন্দর মেয়েটার মনের অতলে অবিনাশ দেখেছে চাপা অতৃপ্তির জ্বালা।

টিয়া বলে ঃ

—তার চেয়ে সহরেই চলো। দাদাকে বলে সাইকেল রিকশা ভাড়া করিয়ে দোব। একবেলা খাটলে আট-দশ টাকা রোজকার! ক হবে দিন-রাত মাঠে এই রোদ-বৃষ্টিতে খেটে খেটে!

চমকে ওঠে অবিনাশ। মাটির কাছাকাছি মানুষ হয়েছে অবিনাশ। সহরে দু-একদিন গেছে, হাঁপিয়ে উঠেছে সে ওখানের জীবনের ভিড়ে। এখানের সবুজ দিগন্ত, তারাভরা আকাশ, মাটির মিষ্টি গন্ধ নেই। ক্ষেতে ধান-এর চারায় বাতাসের শিহরণ, তার মনেও আনে কিসের সাড়া। এসব সে টিয়াকে বোঝাতে পারবে না।

তাই টিয়ার কথায় জবাব না দিয়ে আপন মনে গরুর জন্য খড় কাটতে থাকে অবিনাশ।

টিয়া সরে যায়।

এমনি করেই টিয়ার অবাধ্য মন অবিনাশের কাছে কোন সাড়া না পেয়ে গুমরে ওঠে। মুখ বুজে এখানে রয়ে গেছে মেয়েটা। আজ অবিনাশের মনে হয় টিয়ার কথাগুলো যেন সত্যি হতে চলেছে। ওই জমি-জায়গা সব ওরা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গ্রাম থেকে বের করে দেবে। এখানে এই মাটিতে থাকার অধিকারটুকু হারিয়ে যাবে তার। সহরে কলকারখানার ভিড়ে কুলিগিরি, না হয় সাইকেলরিকশাওয়ালা হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচতে হবে তাদের। অবিনাশের সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নকড়ির মত সোচ্চার হতে পারে না সে। তার মনের

জ্বালাটা আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। একটা কিছু বিহিত তাদের করতেই হবে।

টিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলেছে। ক্রমশ তার অতৃপ্ত মন বাধ্য হয়েই এই বন্দিদশা মেনে নিয়েছে, তবু একটা আশ্বাস তার মনে বাজে।

দাওয়ায় একটা মোড়া নামানো—একটু আগেই প্রভাতবাবু এসেছিলেন। পাশের গ্রামের স্কুলের মাস্টার।...

টিয়া বলে—ওতো নাই। দাসমশাই এসেছেন—ওখানে গেছে সবাই।

প্রভাত চাইল টিয়ার দিকে।

টিয়া বলে ঃ

—এসে পড়বে এখুনিই। বসুন না।

প্রভাত জানে কেন আজ দাসমশাই ওদের সকলকে ডেকেছে। ও এসেছে তাদের কথাগুলো শোনার জন্য। প্রভাত ক'বছর এখানে এসেছে স্কুলের চাকরি নিয়ে, দেখেছে অন্ধকার এই পল্লী অঞ্চলের সহজ-সরল মানুষগুলোকে, ওদের নগ্ন অভাব-দারিদ্র্য, তবু ওদের অন্তরের প্রীতিটুকুকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারেনি।

টিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালার কাজটা কোনমতে সেরে এবার চা-এর জল চাপিয়েছে।

রান্নার চালা থেকে দেখছে প্রভাতকে। টিয়ার মনে হয় প্রভাতের এখানে আসার আসল কারণ বোধহয় অন্য একটা কিছু রয়েছে। ওর অতৃপ্ত নারীমন এমনি অনেক স্বপ্নই দেখে, তার মূলে কোন সত্য আছে কিনা জানে না।

—চা?

প্রভাত অবাক হয়—আবার চা কেন?

টিয়া গাঁয়ের অন্য বৌদের মত জড়সড় হয়ে থাকে না। সহরে বাস করেছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়েছে সেখানে, তাই একটু মুখচোট আছে, আর রূপের চটকও না থাকা নয়। সেটাকে তবু ফুটিয়ে তুলতে পারে। অবশ্য তার জন্য অনেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু

টিয়ার হাসির ঝিলিক অনেকটা ধারালো, ওই দিয়ে অনেক কথার জাল কেটে সে বেরুতে জানে। টিয়া হাল্কা স্বরে বলে ঃ

—বাঃ রে! চা তো খান গো! তা অবশ্যি আমাদের চা তেমন জুতের হবে না।

প্রভাত অপ্রস্তুত হয়ে বলে—না, না। বেশ চা করো তুমি।

টিয়ার মনের অতলে কথাটা জেগেছিল। হঠাৎ বলে ওঠে সে ঃ

—শুনেছি জমি-জিরাত নাকি চলে যাবে। আমার মনে হয় যাওয়াই ভালো।

প্রভাত ওর দিকে চাইল—কেন?

টিয়া বলে ওঠে—ইখানে থেকে কি হবে মাস্টারবাবু? তার চেয়ে সহরে গিয়ে তবু একটা কিছু করতে পারবে।

প্রভাত ওর কথা শুনে অবাক হয়। এ মাটিকে ওরা যেন ভালোবাসতে পারে নি। হয় তো ওই মানুষটাকেও। টিয়ার সারা দেহ-মনে সেই নীরব অতৃপ্তির জ্বালা। মা হতেও পারেনি সে—তাই ঘরের বাঁধন ওকে বাঁধতে পারেনি।

প্রভাত দেখছে টিয়াকে।

টিয়ার সারা মনের অতলে প্রভাতের ওই চাহনি যেন কি একটা ঝড় তুলেছে। নিজেকে আজ সে ওদের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়, অবিনাশের কাছে সে পেয়েছে শুধু অবহেলাই, তাই টিয়ার শূন্য মন নিজের প্রাধান্যকে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখে।

টিয়া বলে ঃ

—এখানে বন্দীবেড়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি মাস্টার। তুমি সহরের লোক, সহুরে মানুষ হয়ে এই অজ গ্রামে কি করে আছো বলতে পারো?

প্রভাত দেখছে বিচিত্র ওই টিয়াকে।

…হঠাৎ বাইরে কাদের কথার শব্দ শোনা যায়। অবিনাশরা ঢুকছে বাড়িতে। নকড়ি হ্যারিকেনের আলোয় প্রভাতকে দেখে বলে ওঠে ঃ

—আরে, ই যে মেঘ না চাইতেই জল গ। অ যতিলাল, উদিকে ডাক, মাস্টার হেথায় রইছে, কথাটা শ্যাষ করে যাই।

রাত্রি নামছে। অবিনাশ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ওর সারা মনের অতলে চাপা সেই জ্বালাটা ফুটে ওঠে। যতিলাল, নকড়ি ওরা সকলেই বলে চলেছে গেণু দাসের কথাগুলো।

প্রভাত বলে ওঠে—জমি তোমরা ছাড়বে না।

যতিলাল এমনিতেই ভীতু মানুষ। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আর তেমন খেতে না পেয়ে তার দেহ-মনের জোর অনেকখানি কমে গেছে।

ও বলে—যদি জোর করে ছাড়িয়ে নেয়!

ওরা জানে গেণু দাস, নিমাই ঘোষ, হারুবাবুদের সেই শক্তি আছে।

অবিনাশ চুপ করে শুনছে ওদের কথাগুলো। টিয়াও দাওয়ার ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভালোই লাগে খবরটা শুনে। এখানের পালা যত শীগ্‌গির ফুরোয় ততই মঙ্গল। অবিনাশকে চুপ করে থাকতে দেখে টিয়ার মনে হয় লোকটাও এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। তাই হয় তো এখানের এই মরামাটি ছেড়ে চলে যেতে চাইবে।

অবিনাশ যতিলালদের কথাগুলো শুনছে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলোর ছবি। তাদের নিজেরই ছিল ওই নদীর ধারে নোনাবাদায় এক লপ্তে আট বিঘে জমি। ওর বাবা বলতো—আকালপোষ জমি। ওই জমিতে জলের জন্য ভাবতে হত না—আর নিজের চোখে দেখেছে ইয়া ধানের গোছ। এক হাতে ধরা যেত না। দীর্ঘ ধানের পুরুষ্ট শিষগুলো বাতাসে শির-শির শব্দ তোলে।...

সেই সব জমি একদিন তাদের বাকী করের দায়ে নিলাম ডেকে নিল গেণু দাস। ওই চককে চক। সেবার ওর লাঠিয়ালরা হানা দিয়েছিল, মাঠকে মাঠ ভরা সোনালী ধান ওরা কেটে নিয়ে গেল। তার বাবা বাধা দিতে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল আলের মাথায়, তাজা

রক্তে সোনা ধানের মঞ্জরী লাল হয়ে উঠেছিল, তবু রুখতে পারেনি, অবিনাশ তখন ছোট।

…আজ আবার ওরা তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায় নতুন করে।

নকড়ি বলে—কিহে অবিনাশ বলো, ওই জমি গেণু দাসের হোক—তাতে ফসল ফলায় কে হে? আমরাই তো! তার জন্য আধা বখরা দিই—ধান ধার নিলে সুদ সমেত ফিরিয়ে দিই খামারে। তবে কেনে কেড়ে লিবেক জমি?

অবিনাশের চোখের সামনে তার বাবার পরাজিত রক্তাক্ত দেহটা যেন ভেসে ওঠে। তার সারা শরীরে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। অবিনাশ গর্জে ওঠে—রুখতে পারবি নকড়ি। দরকার হলে আমরাও দল বেঁধে রুখে দাঁড়াবো। দখল নিতে আসে, এবার লাঠির জোরও দেখিয়ে দোবো। অনেক মার খেয়েছি, এবার জবাব দিতে হবে।

প্রভাতবাবু দেখছেন অবিনাশকে। অন্ধকারে ওর দু'চোখ জ্বলে উঠেছে কি জ্বালায়। এমনি করেই বোধহয় মরীয়া হয়ে মানুষ কঠিন প্রতিবাদের জ্বালায় ফেটে পড়ে।

রমেশও তাজা জোয়ান। সে বলে—আমিও তাই বলি অবাদা। মরতে হয় এবার লড়েই মরবো!

—কে লড়াই করছে র‍্যা! অবা-নকড়াও রইছিস।

ওদের কথার মধ্যে বুড়ি গিরিবালা এসে ঢুকলো। ওকে দেখে চাইল ওরা। বুড়ির বয়স হয়েছে, একটা বাঁশের লাঠি ধরে যাতায়াত করে, কোমরটায় বাত পাকাপাকিভাবে বাসা বেঁধেছে। তবু বুড়ির তেজ এতটুকু কমে নি।

গিরিবালাকে দেখে নকড়ি বলে:

—তুমি আবার ফোড়ন কাটতে এলে কেনে গ ই-কথার মাঝে?

বুড়ি বলে—শোনলাম কথাটা। তা বাপু মাস্টার—তুমি তো নেকাপড়া জানা ছেলে, সহরের বাবুদের কাছে বেত্তান্তটা জেনে-শুনে

যা বলো তাই হবে। এ গোমুখ্যু গোঁয়ারের দলের কথায় কিছু হবে না।

যতিলালও শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা চায়। তাই লড়াই-এর কথায় সেও ভয় পেয়ে গেছল। এবার গিরিবালার কথায় সেও বলে ঃ

—তাই ভালো মাস্টার। এখন সব কথা তো শোনা কথা—ব্যাপারটা আসলে কি জানা দরকার। ঠিক বলেছো পিসী।

প্রভাত শুনেছে এদের কথা। সে বলে--তাই ভালো। তবে হুট করে মাথা গরম করা ঠিক হবে না অবিনাশ।

অবিনাশ বলে—মাথা যে গরম হয়ে যায় মাস্টারবাবু। ঠিক আছে—সবাই শলাপরামর্শ করেন, তারপর যা হয় করা যাবে। তবে বাবু—আম্মোও ছেড়ে কথা কইবো না, আমার ভাতে হাত দিতে এলে।

রাত হয়ে গেছে। প্রভাতবাবুও ফিরে গেছেন বোর্ডিং-এ।

টিয়া গুম হয়ে শুনেছে অবিনাশের কথাগুলো। ওর মনের অতলে যেটুকু ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছিল, সেটা এক ফুৎকারে নিভে গেছে অবিনাশের কথায়।

অবিনাশ বলে—রাত হয়েছে। চল্ খেতে দিবি না?

টিয়া বলে ওঠে—ভাত তো চাপা দিই রেখেছি। ঢাকা খুলে খেয়ে নাও গে।

অবাক হয় অবিনাশ—তুই খাবি না?

টিয়া সংক্ষেপে জবাব দেয়—আমার শরীর ভালো নাই। রাতে খাবো না।

অবিনাশ টিয়ার দিকে চাইল। টিয়ার রূপের খোলতাই ঠিক আছে। মুখে পানের লাল কষ তখনও মিলোয় নি। পরনের শাড়ীটা নিজের হাতে কেচে ইস্ত্রি করে টিয়া। নিজেই শিবথানের মেলা থেকে লোহার ইস্ত্রি কিনে এনেছে। টিয়ার শরীর খারাপ হবার কোন লক্ষণই চোখে পড়ে না। বিকালে চান সেরে খোপাটাও

বেঁধেছে, কপালে দিয়েছে কাঁচপোকার টিপ। তবু গুম হয়ে শরীর খারাপের কথা শোনাতে অবিনাশ অবিশ্বাসের সুরে বলেঃ

—কি যে হয় তোর মাঝে মাঝে, কে জানে বাপু।

টিয়া ওর দিকে জ্বালাভরা চাহনিতে চাইল মাত্র। অন্য দিন হলে সেও কঠিন স্বরে শুধোতো ওই কথা বলার কারণটার সম্বন্ধে। আজ টিয়ার ঝগড়া করতেও রুচি নেই। টিয়া তাই এড়িয়ে গেল অবিনাশকে। মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়ে সে।

অবিনাশ এ ঘটনায় অভ্যস্ত। ও দেখেছে টিয়ার এই জ্বালাটাকে। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, ওর মন বসাবার চেষ্টা করেছে অনেক-ভাবে এই মাটিতে, কিন্তু অভাবের কাঠিন্যে নয়—টিয়ার অতৃপ্তিই তার সংসারে মাঝে মাঝে কি অশান্তির জ্বালা এনেছে। অবিনাশের মনও তিলে তিলে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তার সামনে আজ টিকে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। অবিনাশ দেখেছে গেণু দাস, নিমাই ঘোষ, হলধরবাবু—এ এলাকার সব জোতদারদের প্রকৃত স্বরূপটাকে, ততই যেন জ্বালাটা বেড়েছে তার। টিয়ার কাছেও সে কোন সমবেদনা-আশ্বাস পায় নি। চুপ করে জল-দেওয়া ভাত আর একটু পোস্ত-চচ্চড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল অবিনাশ। টিয়াকে কিছু বলারও তার নেই।

রোদের তাতে সারামাঠ জ্বলছে। গ্রামসীমা সেই লি লি রোদে কাঁপছে।

জ্যৈষ্ঠমাসের ধূ-ধূ রোদের জ্বালাভরা দিনের শেষে অবিনাশ নদীর ধারে তার সব্জীক্ষেতে জলসেচ করছে। পলি মাটিতে সারবন্দী ঢেঁড়স-ঝিঙে-ডাঁটা-বেগুন গাছ লাগিয়েছে তারা, নীচু জমিতে কিছু বোরো ধানও বুনেছে। নশীপুরের চাষীদের কাছে এই নদী আর এই পলিচর সোনা ফসলের ক্ষেত। নীচু জমিতে জয়া-পদ্মা ধানের চাষও শুরু করেছে তারা। জল তোলে নদী থেকে। বুকটান ধরে দোনা টানতে।

যতিলাল বলে—ইবার একটা পাম্প কিনবো হে। তা ব্লকের

বাবুরাই তো খাবেন শাঁসটুকু, আমরা ছোবড়া চুষে আর ইসব করতে পারি ?

নকড়ি ওদিকে পটল কিছু লাগিয়েছে। পটলের দরও পায় ভালো। মহাজনরা ক্ষেতে এসে নিয়ে যায় সব্জী। কিছু হাটেও নিয়ে যায় তারা। নকড়ি গোছানো লোক।

তার নিজের পাম্প সেট একটা আছে। সেটা দিয়ে ধানের মাঠে জল তুলছে সে। নকড়ি বলে—তা বাবু যে পূজোর যে মন্তর, তা পড়তে হবে বৈকি। দিয়ে থুয়ে ঘরে তোল কেন্নে পাম্পটো। তারপর—

অর্থাৎ তারপর নকড়ি যে আর ওমুখো হয় নি, ব্লকের বাবুরাই এবার নকড়ির পিছনে ঘুরছে টাকার জন্যে, তা অবিনাশ কেন, সকলেই জানে।

এসব ভালো লাগেনা অবিনাশের। এ-ভাবে সে কিছু পেতে চায় না।

অবিনাশ জবাব দিল না, হাতের টানে শূন্য দোনাটাকে টেনে জলে ডুবিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আপন ভারে জল-ভর্তি দোনাটা উঠে গিয়ে ক্ষেতে পড়ছে। মাটির বুকে ওই জল কোনদিকে চলে যায়, ভিজে ভিজে সুবাস ওঠে।

...বিকাল গড়িয়ে গেছে। মুক্ত উদার দিগন্তে নদীর বালুচরে সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যা নয়, কালো একটা মেঘ চারিদিক ঘিরে এগিয়ে এসেছে। অবিনাশ মাঠেই থাকে সারাদিন প্রায়। ঘরে টিয়ার সঙ্গে তেমন বনে না, টিয়াও এই জীবনকে মেনে নিতে পারে নি। দেখেছে অবিনাশ যতিলালের বৌ, নকড়ির বৌ, ওরা মাঠে আসে ওদের জন্য মুড়ি-ভাত নিয়ে। যতিলালের বৌকে দেখেছে তিন পহর বেলায় নদীর ধারে ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে যতিলালকে খাওয়াতে, দুজনেই খায় এখানে। ওদের যেন চড়ুইভাতির উৎসব জমে প্রায়ই। তবু অবিনাশ ভাবে এসব ভুল ভাঙ্গবে টিয়ার। এ বছরের ফসল পেলে অবিনাশ টিয়ার জন্য হার একটা গড়াবে। আর সহর থেকে

ভালো শাড়ি দুখানা কিনবে। জয়া ধানের গাছে গাছে এসেছে মঞ্জরীর পুঞ্জে সোনালী পূর্ণতা। এই এলাকার সেরা ধান করেছে সে।

কয়েকটা বছর এভাবে ফসল পেলে সে এবার নিজের হারানো জমির বেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনবে। তখন আর পরের জমি ভাগচাষ করে ওদের দয়ায় সে বাঁচবে না, বাঁচবে নিজের জমিতে। নিজের পরিশ্রমের ফসল আহরণ করে। সেই দিনের স্বপ্ন দেখে অবিনাশ, টিয়াকে সেটা বোঝাতে পারেনি।

হঠাৎ চাপা একটা শব্দ ওঠায় চাইল অবিনাশ। আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে মেঘে—স্তব্ধ দিগন্তসীমার শালবনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে মত্ত ঝড়ের তাণ্ডব। লাল-ধূলোর আস্তর মাখা কোন রুদ্র সন্ন্যাসী যেন হুঙ্কার তুলে এগিয়ে এসে শান্ত জনপদ-প্রান্তরের বুকে নেমেছে। ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে তার জটাজাল, মত্ত হুঙ্কারে দিক-বিদিক্ মুখরিত করে তুলেছে।

···একটা বিজলীর ঝলক সারা আকাশকে ফেড়েফুড়ে ঝলসে ওঠে—কাঁপছে ওই প্রান্তর। তরপরই নেমেছে বৃষ্টির ধারা। চমকে ওঠে অবিনাশ! ··সামনে পাঁচ বিঘে ধানের ক্ষেতে মঞ্জরী ভারাবনত পাকা ধানের ফসল। আকাশের দিকে চাইল সে। ধোঁয়াটে-ঘোলাটে বিবর্ণ আকাশ। বৃষ্টির অঝোর ধারায় তার সারা গা ভিজছে—তবু মনে হয় শেষ গ্রীষ্মের মেঘ—দু-এক পশলা বৃষ্টির পরই থেমে যাবে এই তাণ্ডব। বাড়ির দিকে চলেছে অবিনাশ।

···টিয়ার নিজের দুটো গরু আছে। ওগুলোর হেপাজত করে সে—আর দুধও কিছু হয়। দু'জনের সংসার। টিয়া ওই দুধটা নিজে নশীপুরের দু-একটা বাড়িতে যোগান দিয়ে আসে। তবু কিছুক্ষণের জন্য সে বের হতে পারে।

টিয়া দুধ দিতে এসেছিল নশীপুরের এ পাড়ায়। ফেরার পথে ঝড় উঠেছে হঠাৎ। আর সেই সঙ্গে নেমেছে বৃষ্টি। টিয়া দৌড়চ্ছে—

তার দেহের ছন্দটা এই মুখ-আঁধারি বেলায় দেখার কেউ নেই। ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে তার চুল, শাড়ীর আঁচল। আর বৃষ্টিতে এর মধ্যে ভিজে নেয়ে উঠেছে। সামনের বড় বাড়ির চাতালে উঠে পড়েছে। বিদ্যুতের ঝলক আর বাজের শব্দটায় খুবই ভয় লাগে টিয়ার, মনে হয় সারা আকাশ যেন ভেঙে পড়বে ওর মাথায়। মেয়েটা দৌড়ে গিয়ে ওই বড় বাড়ির চাতালে আশ্রয় নিয়েছে, তখন ভিজে গেছে ওর সারা শরীর।

…গেনু দাস মাঝে মাঝে এ বাড়িতে এসে উঠে। আজও বৈকালে সে কিছু কাগজপত্রের হিসাব-কিতাব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ওই ঝড়ো হাওয়ায় কোথায় বিজলির লাইনে গোলমাল হওয়ায় বাতিটা নিভে গেছে, গেণু দাস বের হয়ে এসেছে চাতালে। হঠাৎ সামনে ওই টিয়াকে দেখে চাইল। এক ঝলক বিদ্যুতের আভায় দেখছে মেয়েটার অসংযত বেশবাস। সারা দেহের নিটোল পূর্ণতা বৃষ্টির জলে ভিজে আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। টিয়ার খেয়াল নেই। নির্জন চাতালে আবছা আঁধার নেমেছে, ও ভেবেছে এখানে কেউ নেই, তাই ভিজে শাড়িটা গা থেকে খুলে নিংড়ে নিয়ে হাওয়ায় ধরেছে। আদুড় গা—মুখের ধারালো আদল—ওই দেহের মদিরতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে। হঠাৎ চমকে উঠে মেয়েটা কার পায়ের শব্দে।

—কে!…

এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তিটা। টিয়া শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কৌতূহলী চাহনি মেলে চাইল।

—দাসমশাই!….

গেনু দাস দেখেছে ওকে। মুখচেনা—কিন্তু ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

তবু শুধোয় সে—কোথাকার গো তুমি?

…টিয়া দেখছে লোকটাকে। এ চাকলার মহামহিম ব্যক্তি। তবু টিয়া ওই বিদ্যুতের আলোয় এই রাত নির্জনে দেখছে বিচিত্র একটি

মানুষকে, যার চোখে ফুটে উঠেছে নীরব একটা তৃষ্ণার জ্বালা। ধূর্ত মেয়েটা চেনে এই চাহনিকে।

টিয়া সহজভাবে বলার চেষ্টা করে—

উত্তর নশীপুরের মোড়লদের বাড়ির গো দাসজী। দুধের রোজ দিতে এসেছিলাম।

এবার দাসজী চিনতে পারে—অবার না তুমি?

টিয়ার হাল্কা ঠোঁটে একটু হাসির ধারালো আভাস ফুটে ওঠে। গেণু দাস দেখছে ওকে। টিয়া জানে ওর পরিচয়, ওই একটি মানুষ এই এলাকার সব মানুষের অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আজ নিজের প্রাসাদ বানিয়েছে। সেদিন দেখেছিল টিয়া নকড়ি, যতিলাল, অবিনাশদের চোখে নীরব ভয়ের আতঙ্ক, সব হারাবার আতঙ্ক।

টিয়া তাই ওই মানুষটাকে কাছ থেকে দেখতে চায়।

গেণু দাস বলে—তা এখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে যাবে। বারান্দার এদিকে এসো।

টিয়া বলে ওঠে—বৃষ্টি ধরে আসছে মনে হয়।

গেণু দাস হাল্কাস্বরে বলে—যদি না ধরে?

টিয়া জানায়—বৃষ্টির মধ্যেই চলে যাবো। এমন ভেজা তো অভ্যেস আছে গো বাবু!

হঠাৎ ওই বৃষ্টির মধ্যে জিপটাকে আসতে দেখে চাইল। গেণু দাসও দেখেছে সেই হেডলাইটের নিশানা। কেতুলাল ফিরছে সহর থেকে। আজ রাতে অধর মাস্টার—আরও দু-একজন আসবে, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হবে। গেণু দাসের মনে হঠাৎ সেই কূট চালগুলো ভেসে উঠে। ও যেন অন্য জগতে হারিয়ে যায়।

মেয়েটার কথাও ভুলে গেছে সে। এগিয়ে গেল ওদিকে।

বৃষ্টি কমে এসেছে। টিয়া এই ফাঁকে পিছনের পথ দিয়ে চলে যাবে ঝিমঝিম বৃষ্টির মধ্যে।

কেতুলালের সন্ধানী চোখে পড়েছে ওই মেয়েটি। জিপের

হেডলাইটের আলোয় দেখেছে সে টিয়ার দেহের অফুরান ঢল নামা যৌবনপ্রবাহকে। কেতুর ধারালো চোখের চাহনি এক নিমেষেই মেয়েটার সারা দেহ যেন পরখ করে নিয়েছে।

গেণু দাসকে এমনি আঁধার নির্জনে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে কেতুলাল। টিয়াকে সেও চেনে। তাই বলে ওঠে কেতুলাল ঃ

—দাসমশাই-এর ব্যাঘাত ঘটালাম না তো ?

গেণু দাস চতুর লোক। ওর কথার ইঙ্গিতটা বুঝেছে। তবু সহজভাবেই বলে—আমার সবকিছু তো তোমাদের জন্যে হে। আমার ব্যাঘাত-ট্যাঘাতের কোন প্রশ্নই নেই।

কেতুলাল হেসে ওঠে,—তাহলে আমার কথাটা ভাবো দাসজী।

…টিয়া শুনেছে ওদের কথাগুলো। মেয়েটা এমনি নির্জনে দেখেছে ওদের ভিতরের স্বরূপ। একটা মস্ত খবর তার জানা হয়ে গেছে। নিজের কাছেই মেয়েটার দাম বেড়ে যায় অনেকখানি। ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে।

তখনও থেকে থেকে বিদ্যুতের আভা উল্‌সে ওঠে সারা আকাশ ফুঁড়ে। টিয়ার মনে হয় সেও অনেক কিছু অঘটনই ঘটাতে পারে, আর অজান্তেই সেই খবরটা সে পেয়ে গেছে।

এই বৃষ্টির মাঝে হঠাৎ হাসছে মেয়েটা। নিজের সুপ্ত মনের অতল থেকে জেগেছে একটা বিচিত্র সত্তা—যে ওই বিজলীর ঝলকের মতই চঞ্চল, শক্তিময়ী আর অগ্নিগর্ভা।

বাড়ি ফিরে অবিনাশ টিয়াকে দেখে চাইল। সারা গা মাথা শাড়ি ভিজে গেছে। দেহের খাঁজে খাঁজে বসেছে ওর শাড়িটা, অবাক হয়ে দেখছে অবিনাশ, যৌবনমাতাল্ বিচিত্র একটি মাদকতাময়ী মেয়েকে। এ যেন অন্য টিয়া।

—কোথায় গিইছিলি রে ? অবিনাশ সুধোয়।

—হাতের শূন্য ঘটিটা দেখে অবিনাশ বুঝেছে দুধের রোজ দিতে

গিয়েছিল। কিন্তু টিয়া সারা দেহে উদ্দাম লম্ফ তুলে হাল্কা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলে ঃ

—মরতে! তা যম বল্লে তুমি খুব সোন্দর। এত সকাল মরে কি হবে। তাই ফিরে এলাম, জ্বালার তো শেষ হয়নি এখনি!

অবিনাশ ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে না। টিয়া আলনা থেকে একটা শুকনো শাড়ি টেনে নিয়ে বলে ওঠে ঃ

—বিমুখ হয়ে বসো দিকি! ইগুলান ভিজে গোবর হয়ে গেছে। বদলে ফেলি। কি হিম রে বাবা! জাড়ে কালিয়ে গেলাম।

অবিনাশ সরে যায়। টিয়া এমনিই হাসিখুশি, আবার যখন তখন কি রাগে ফেটে পড়ে। ওকে বোঝা দায়। তবু টিয়ার আজকের পরিবর্তনটা অবিনাশের চোখে পড়েছে।

টিয়া উনুনে চা চাপিয়েছে, কাঠের আঁচের একটু লাল আভা পড়েছে ওর নিটোল ফর্সা গালে। এমনি বৃষ্টিনামা রাত নির্জনে ওই পরিবেশে টিয়াকে যেন হঠাৎ ভালোবাসতে ওর ইচ্ছে করে, কিন্তু অবিনাশ দেখেছে আগেকার মনটা—সেই হঠাৎ খুশিতে ভরে ওঠার মত মানসিক পরিবেশটাও হারিয়ে গেছে। টিয়ার জন্য দুঃখ হয়, ওকে কিছুই দিতে পারে নি অবিনাশ। ওর মনের কোন সাধই পূর্ণ হয় নি। এমন কি মা হতেও পারেনি টিয়া। তাদের ঘর শূন্যই রয়ে গেছে।

আর বেড়েছে অভাব আর সমস্যাগুলো।

—কি দেখছো গো?

অবিনাশ টিয়ার ডাকে চাইল। টিয়ার দুচোখে আজ বিচিত্র একটা চাহনির মাদকতা, হঠাৎ ওই ঝড়-বাদলের মাতন টিয়াকে যেন বদলে দিয়েছে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে গেণু দাসের সেই চাহনি, ওতে দেখেছে টিয়া কি নেশার ব্যাকুলতা পুরুষ জাতগুলোকে দেখেছে টিয়া। আজ তার রক্তেও কি একটা নেশা এসেছে। অবিনাশের ওই কথা ভাবার অবকাশ নেই।

আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে সে। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণই নেই। ঝড় থেমেছে কিন্তু আকাশ জুড়ে ঘোলাটে মেঘ জমে বসেছে আর অঝোর বৃষ্টির শব্দে ভরে উঠেছে চারিদিক। মাঠে পাকা ধানের গাছগুলোর কথা মনে পড়ে। হয় তো পাহাড়ী নদীর ঢল নামবে এই হঠাৎ বৃষ্টিতে! তারপর!

অবিনাশের চোখের সামনে কি সর্বনাশের ছায়া ঘনিয়ে আসে। টিয়ার ওই আহ্বানে সাড়া দেবার মত মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। অবিনাশ বলে:

—সর্ব্বোনাশ হয়ে যাবেক রে এই বর্ষায়, মাঠ জুড়ে পাকা ধান পড়ে রইল।

টিয়া ওর দিকে চাইল একটু হতাশা ভরে। অভিমানী মেয়েটার মনে হয় অবিনাশের কাছে তার কোন দামই নেই। ওর কাছে ওই মাটি-জমি-ধান-ফসলই সবচেয়ে বড়। সেই ভাবনাগুলোর জমাট দেওয়ালে বারবার মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ হয়েছে টিয়া। তার সারা মন কি বেদনার্ত হাহাকারে ভরে উঠেছে। এখানে তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নেই।

টিয়া চুপ করে থেকে বলে—রাত হয়েছে। খেয়ে নাও। ঘরদোর হেঁসেল মুক্ত করতে হবে।

টিয়ার মনের সেই সুরটা এমনি করে বারবার কি চরম হতাশায় হারিয়ে গেছে। গুমরে উঠেছে ওর ব্যর্থ নারীমন। অবিনাশ সে খবর রাখে না।

…রাতভোর বৃষ্টির পরও আকাশ তেমনি মেঘে মেঘে ঢেকে রয়েছে। ছাড়ার নাম নেই! অবিনাশ ভোর হওয়ার মুখেই বের হয়েছে। তখন সবে ফর্সা হচ্ছে। সূর্য ওঠার নাম নেই— বৃষ্টি সমানে চলেছে। বৃষ্টির জল জমেছে খালে ডোবায়। মাঠের ওখানে গিয়েই চমকে ওঠে।

কাজলাদীঘির উঁচু পাড় থেকে দেখা যায় আদিগন্ত মেঘভার যেন

নুইয়ে পড়েছে আর নদীর দিকে চেয়ে চমকে ওঠে অবিনাশ। রাতারাতি সেই আধমরা নদীর রূপ বদলে গেছে। নেমেছে গেরুয়া ঢল, নীচু জমিগুলোয় জল জমেছে।

ওই বৃষ্টির মধ্যে অবিনাশ এগিয়ে আসে কি ব্যাকুলতা নিয়ে তার ধানের ক্ষেতের দিকে। অনেক কষ্টে জল টেনে টেনে ওই পাঁচ বিঘে জমিতে আই আর এইট ধান দিয়েছিল সে। সার গোবর দিয়ে দিনরাত হেপাজত করেছে। নিজের সঞ্চিত কিছু টাকার সবটাই ঢেলে ওই জমিতে সে এই অঞ্চলের সেরা ধান ফলিয়েছে। রাশি রাশি মঞ্জরীতে ঢেকে গেছে গাছগুলো, যেন ধানের স্তূপ হয়ে আছে ক্ষেতে। আজকালের মধ্যে কাটতো।

কিন্তু ওই গেণু দাসের জরুরী ডাকে কাল ওদের যেতে হয়েছিল সব কাজ ফেলে, শুনে এসেছে চরম সর্বনাশের কথা আর কালই নেমেছে আকাশজোড়া বৃষ্টি। ধান কাটতে পারেনি লোকজন নিয়ে।

আজ ওই ধানক্ষেতের বুকে নদীর কাটা খাল ছাপিয়ে এসে পৌঁছেছে গেরুয়া জল। চমকে ওঠে অবিনাশ, গাছগুলোর মঞ্জরীতে এসে পৌঁছেছে সেই জল। সোনা রং-এর সব দাক্ষিণ্যকে কি নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তছনছ করে দিয়েছে।

অবিনাশ দেখছে তার চরম সর্বনাশটাকে। চোখের সামনে তার যথাসর্বস্ব যেন লুঠ করে নিতে চায় নিষ্ঠুর কোন বিধাতা।

নকড়ি যতিলালও এসেছে। ওদের ক্ষেতে জল এখনও পৌঁছেনি। যতিলাল বলে—কি দেখছো গো অবাদা, গাঁতিতে লেগে যাই, নালে ধানগুলোন যে সব যাবেক এই বানে।

সুখী ধান। যেমন প্রচুর ফলে এরা তেমনি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। নরম খড়গুলো এক রাতের জলেই পচে গেছে, তবু ওরা দল বেঁধে মাঠে নেমেছে।

খড়গুলো ধরা যায় না। কাস্তে লাগাবার উপায়ও নেই। আর আল্‌গা ধানগুলোর অর্ধেক মঞ্জরী থেকে ঝরে ঝরে জলে পড়ে যাচ্ছে। জলে কাদায় ওই রাশ রাশ সোনাধান ছিটিয়ে পড়ে।

অবিনাশ গুম হয়ে দেখছে তার এই সর্বনাশটাকে। এত আশা-স্বপ্ন সব ওই নিষ্ঠুর বিধাতার অভিশাপে ব্যর্থ হয়ে গেল। কোনমতে পচা গলা ধান খড়-এর স্তূপ খানিকটা এনে হাজির করেছে বাড়িতে।

টিয়া দেখছে এই সর্বনাশটা।

সেও অবাক হয়—ইকি গো?

অবিনাশ কথা বলে না। জলে-বৃষ্টিতে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গে কাদা আর পচা খড়ের আস্তরণ। ও যেন পরাজিত একটা লোক। বেদনার্ত চাহনিতে চেয়ে আছে টিয়ার দিকে। অবিনাশ বলে:

—কাল ওই গেণু দাসের ডাকে গিয়ে এই হল বৌ। আরও কি সব্বোনাশ হবে জানি না।

গেণু দাস-এর ডাকে হাজিরা দিতে যাবার ফলেই কাল ওরা কাজ করতে পারেনি। নাহলে ওই ধান সব কালই ওরা কেটে আনতো—তার ঘর ভরে যেতো সোনা ধানের স্তূপে। কিন্তু তা হয়নি—তার বদলে এসেছে খানিকটা পচা কাদামাখা ধানের স্তূপ। পচে গেছে—এবার কল বেরিয়ে যাবে। তার প্রচুর লোকসান হয়ে গেল।

টিয়া কি ভাবছে।

গত সন্ধ্যার বিজলির ঝিলিক আর মেঘের গর্জনমুখর অন্ধকারে সে দেখেছিল একটা লোককে, তাকেও দেখেছিল সে! তার চোখে দেখেছিল টিয়া কি আদিম লালসা। ওর বৃষ্টিভেজা দেহটাকে যেন চোখ দিয়ে গিলে খেতেই চেয়েছিল সে।

টিয়া চুপ করে ভাবছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। তখনও সমানে চলেছে। গরুগুলির কথা টিয়ার খেয়াল হয়। ওদের খেতে দিতে হবে। ডাহরিতে বের হতে পারেনি গোয়ালেই বাঁধা আছে ওরা।

একনাগাড়ে বৃষ্টি চলেছে। বদন ডাক্তার নশীপুর হাটতলার ওদিকে একটা চালাঘরে বসে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। বদন এখানের পুরানো লোক—এককালে তারই নামডাক ছিল এই

দিগরে। বিস্তীর্ণ মাঠান এলাকা, মাঠের বুকে এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটা গ্রামবসত। ওদিকে বনের মধ্যেকার বসতের লোকজনের কাছে বদন ডাক্তারই ছিল একমাত্র ভরসা। সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে বদন যেতো গাঁয়ে গাঁয়ে—তার ভিজিটের বালাই নেই। ইনজেকশনও দিতে পারে, আর নাড়ি টিপে সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধের বাক্স খুলে যা হয় কিছু দিতো। চলমান ডিসপেনসারীই বলা যেতো তাকে।

কালো চিমড়ে চেহারা, অবশ্য লোকে আড়ালে বলতো—পোড়া কাঠ।

কেউ বা আর একটু এগিয়ে যেতো, তাদের ভাষায় বলতো—আংরা।

তবু বদনের দিন চলে যেতো ওইভাবে। ইদানীং নশীপুরে সরকারী ডিসপেনসারী হয়ে মুশকিল হয়েছে তার। তার কাছে রোগীরা বড় একটা আসে না—ওখানেই পাশ করা ডাক্তারের কাছে যায়। অবশ্য ওষুধপত্র তেমন থাকে না সেখানে।

আর বদন এখন তার কাজের পরিধি একটু বাড়িয়েছে মানুষের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং গরু মোষের চিকিৎসাও করে। আর কিছু বাঁধা খদ্দের এখনও আসে ওই মাঠ প্রান্তরের বসতে তাইতে চলে কোনমতে।

বদন অবশ্য চুপচাপ বসে থাকে না। আজ আটকে পড়েছে বর্ষায় আর কাজলা নদীর বানের দাপটে। বেলা হয়ে গেছে। অন্য দিন হাটবারে লোকজন আসতে সুরু করে মালপত্র, আনাজপাতি নিয়ে। বাঁধা দোকানের ব্যস্ততা দেখা যায়। রসিক ময়রার দোকানে তেলেভাজার কড়াই চেপে যায়। আলুর চপ, পেঁয়াজি ভাজা শুরু হয়। বাতাসে পোড়া তেলের গন্ধ ওঠে।

মদনের কাপড় গামছার দোকানে লোকজন আসতে শুরু হয়। আর বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে কিছু উটকো ফিরিওয়ালার দল সস্তা মনোহারি জিনিস—আয়না, ফুলেন তেল, গেঞ্জি-শাড়ি-ফ্রক-এর

বাণ্ডিল, ধন্বন্তরী দাদের মলম, হজমের যম—এ সব নিয়ে এসে আসর সাজিয়ে বসে। বাঁশবন, আম, বটগাছ ঘেরা জায়গাটা লোকের ভিড়ে আর কলরবে ভরে ওঠে।

আজ নিঝুম দু' একজন চাষী কিছু কুমড়ো কচু এনেছে, তারাও এখানে ওখানে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য। বৃষ্টি থামারও নাম নেই।

বদন ডাক্তার পাখার উল্টো পিঠ দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলে ওঠে পাশের সেলুনের হরিপদকে—আজ কি মাছি ওড়াবি রে হরি? লোকজন সব গেল কোথায়?

হরিপদ উৎকর্ণ হয়ে কি শুনছিল।

স্তব্ধ বাতাসে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে আসে নদীর মত্ত গর্জনের শব্দ। দূরে কোথায় যেন কলরব উঠছে। হরিপদ বলে:

—খেয়া বন্ধ গো, লোকজন আসবে কি করে!

বদন অবাক হয়—এত বড় বান! বলিস কি রে! খেয়া বন্ধ?

হঠাৎ স্তব্ধতা ছাপিয়ে কলরব ওঠে। হরিপদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। বদনও অবাক হয়।

—কি রে?

—আজ্ঞে মদনপুরের বাঁধে হানা পড়েছে। সকাল থেকেই লোকজন গিয়ে পড়েছে ওখানে। অসময়ের বান—বাঁধও ঠিক নাই। যদি একবার ফেটে যায় বিবাক ভাসিয়ে দিবেক। তাই লোকজন হাটেও আসেনি ওখানেই গেছে সব।

বদন ডাক্তার অবাক হয় খবরটা শুনে। হঠাৎ তার যেন করার মত একটা কাজ এসে গেছে। চতুর সন্ধানী লোক বদন দত্ত। বেশ বুঝেছে, আজ খদ্দেরপত্র আর তেমন হবে না।

বদন বলে ওঠে—বলিস কি রে? এ যে ভরাডুবি হবে রে বাঁধ ভাঙ্গলে।

তাক থেকে সাদা কাপড়ের পট্টি লাগানো ছাতাটা নিয়ে

মালকোচা মেরে চিমড়ে বদন দত্ত বের হয়ে পড়লো এই বৃষ্টিতেই।

…অসময়ে বান এসেছে ঠিক প্রথম বর্ষার আগেই। পাহাড় অঞ্চলেও কদিন অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে, তাই কাজলা নদীর শূন্য বুক জুড়ে নেমেছে গেরুয়া ঢল, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলরাশি মত্ত প্রবাহে বয়ে চলেছে। এর মধ্যে বৃষ্টির জল জমেছে দুদিকের গ্রামের মাঠে। সব্জীপত্র যা ছিল সব ডুবে গেছে। ডুবে গেছে ধানক্ষেত, আখের বিস্তীর্ণ সবুজ জমিগুলো।

বাঁধের উপর লোকজন জমেছে। গেয়ো জলস্রোত এসে হানা দিয়েছে মদনপুরের বাঁকের মাথায়। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলছে ওরা।

আশপাশের গ্রামের লোকজন এসে ভেঙ্গে পড়েছে বাঁধ বাঁচাতে।

অবিনাশ যতিলাল নকড়ি দেগাঁয়ের রঞ্জনের লোকজন আশপাশের গ্রামের সকলেই এসে পড়েছে। জমিজারাতের ফসল গেছে, এবার এই বানের সাপট হেনেছে তাদের জমিজারাত, ঘরবাড়ি —তাদের অস্তিত্বের উপরই। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে এই জলস্রোত বালির পাহাড় ঠেলে নিয়ে ঢুকবে তাদের জমিতে, কোথাও খাল করে দেবে—গ্রামবসতের মাটির ঘরবাড়িগুলোকে উড়িয়ে দেবে। জমিতে বালির পাহাড় বানাবে।

সেই চরম সর্বনাশের ছবিটা দেখে আজ তারা মরীয়া হয়ে ছুটে এসেছে বাঁধ বাঁধার জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি পড়ছে বাঁধে, প্রভাত-বাবুরাও স্কুল থেকে এসে হাজির হয়েছেন। বাঁশ তালপাতা সব দিয়ে বাঁধের সামনে খুঁটি পুতে মাটি ফেলছে। তারা যেন যুদ্ধ করছে নদীর সঙ্গে।

কিন্তু ওই মারমুখী নদীর ধারালো জিবের সাপটে ওই মাটিটুকুও সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে যায়। আবার জলের ধারালো ছোবল এসে আঘাত হানে বাঁধের গায়ে। বৃষ্টির ধারায় স্নান করে গেছে সকলেই। তবু ওদের চেষ্টার অন্ত নেই। প্রভাতবাবুও লোকজনদের নিয়ে

বাঁধে লড়ছেন। এ যেন একটা হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গেই লড়ছে তারা।

হঠাৎ দেখা যায় বদন ডাক্তারকে। মাথায় ছাতি, কোমরে কাপড়ের উপর গামছাটা জড়ানো। সেও জলকাদা মেখে ওদের লড়াই-এর সামিল হয়ে চীৎকার করে—মাটি! মাটি ফেল!

প্রভাতবাবু চাইল ওর দিকে। বদন জানে কোথায় কি বলতে হয়। চীৎকার করে সে—শালারা বাঁধ করেছে! এ যে ঘোগের বাসা গো—চারিদিকে শুধু ইন্দুরগাড়া।

জীর্ণ বাঁধটা ওই প্রচণ্ড জলের চাপ সইতে পারছে না। বাঁধের এদিক ওদিকে ইঁদুরের গর্ত, সেগুলোতেই বিপদ ডেকে আনে। ওই গর্তে ঢুকেছে নদীর জল, আর বাঁধের ভিতরের সেই গর্তগুলোয় জল ঢুকে এবার ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে। থর থর কাঁপছে বাঁধটা।

চীৎকার করে ওঠে প্রভাত—সরে যা অবা! সরে যা—

ওরাও বুঝতে পেরেছে তাদের এত লড়াই সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। উন্মত্তা কাজলা নদী এবার তাদের উপর চরম আঘাত হেনেছে। একটা সাপটে বিরাট খানিকটা মাটির চ্যাঙ্গড় ধসে পড়ে—তারপরই একটা প্রচণ্ড শব্দে বাঁধের বেশ খানিকটা অংশ ছাড়িয়ে নিয়ে সফেন গেরুয়া ঢল লাফ দিয়ে নামল এ দিকের ক্ষেতে—চীৎকার আর্তনাদ ওঠে—রুদ্ধমুখ জলধারার উন্মত্ত গর্জনে ওদের আর্ত চীৎকার দিক-দিগন্তের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম গ্রামান্তরের লোকও শুনেছে সেই সর্বনাশা আর্তনাদ।

—বাঁধ ভেঙ্গেছে—কাজলা মোড়ের বাঁধ!

আর করার কিছুই নেই। ওদের চোখের সামনে তখন নদীর জলস্রোত লাফিয়ে পড়ছে। বদন ডাক্তার চীৎকার করে।

—উ শালাদিকে ডাকো হে! বাঁধ বাঁধার মালিক সেই কেতুলালকে ডাকো।

ওর কথার জবাব দেবার মত অবস্থা কারোরই নেই। চারিদিকে বয়ে চলেছে জলস্রোত। ওরা এবার গ্রামবসতের দিকে ছুটেছে।

যদি কোনরকম ঘরবাড়ি—গরু-বাছুর—নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পারে।

কেতুলাল অবশ্য খবরটা পেয়ে গেছে। গেণুবাবুও জানেন বাঁধ ভাঙ্গার খবর। কেতুলাল তখন ওই গেষ্ট হাউসেই রয়েছে। গেণু দাসও এসে হাজির হয়। ছাদ থেকে দেখা যায় জল আর জল। অবশ্য তাদের এখানের টিলায় জল পৌঁছবে না। কেতুলাল বলে ঃ

—মুশকিল হ'ল গেণুবাবু!

গেণু দাসের কিছু ক্ষতি হবেই। আখের ক্ষেতের বুকে জল দু-তিন দিনের বেশী থাকলে সবই যাবে। আর যাবার তেমন কিছুই নেই! বরং ক্ষতির তুলনায় লাভ বেশীই হবে। মনে মনে সেই হিসাবটাও কষে নিতে দেরী হয় না গেণুবাবুর। ওসব পরিকল্পনা আর লাভ-ক্ষতির মানসাঙ্ক কষতে গেণুবাবুর বুদ্ধির অভাব হয় না।

ওই পঞ্চগ্রামী লোকগুলোর চড়া মেজাজের রূপটা সে দেখেছিল কয়েকদিন আগে। ওদের তেল মরবে এই বানের পর। আবার তাদের কাছেই মাথা নীচু করে আসতে হবে তাদের। সেটা কম লাভ নয় গেণু দাসের, তা ছাড়াও অন্য একটা বিরাট ব্যাপারও রয়েছে। তাই কেতুলালের কথায় গেণু দাস পরম দরদীর মত বলে।

—তাতো হল কেতুলাল। সারা এলাকার হাজার মানুষের সামনে এবার অভাব-অনটন-উপবাস সবই এলো কেতুলাল। সামনে বর্ষা, চাষ আবাদের কথা আছে। আর বাঁধ বাঁধতেই হবে যেভাবে হোক। ক'মাস মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

কেতুলালও ভাবছে কথাটা। কিন্তু সমাধানের পথ সে খুঁজে পায় না। তাই বলে ঃ

—কি করে কি হবে গেণুবাবু?

গেণু দাস এসব হিসাব আগেই কষে ফেলেছে। এবার তাদের ভূমিকা হবে অন্যরকম। তাই বলে ওঠে গেণু দাস ঃ

—উদ্ধার করতে হবে ওদের সকলের আগে। তারপর সরকারী রিলিফের দরকার। বীজধানও দিতে হবে। আর বাঁধ বাঁধাতে হবে।

কেতুলালও এবার যেন লাইন ধরতে পায় এই গেণুবাবুর কথার মধ্যে।

ইস্কুল তৈরীর ব্যাপারে দু'জনে একত্রে ওই শিক্ষা বিস্তারের ব্রত নিয়ে কাজ করেছিল, পেয়েছিল বেশ কিছু। এবার সামনে তাদের বিরাট কর্মযজ্ঞ। বিরাট সমস্যা—সুযোগও।

কেতুলাল বলে—এসব করতেই হবে গেণুবাবু। আমি ডি-এম সাহেবের কাছে যাবো। রিলিফ আনতেই হবে।

গেণু দাস আরও বড় জায়গায় চার ফেলতে চায়।

তাই জানায়—মিনিষ্টারদের কাছেও যেতে হবে কেতুলাল। খবরের কাগজওয়ালাদেরও খবর দিতে হবে। ডি-এম তো আছেনই। ওই সব জায়গাতেও খবর দিতে হবে—দরবার করতে হবে। এই এলাকার মানুষদের জন্য কিছু করা দরকার। এ আমাদের দাবী।

গেণু দাস সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে গেছে। ঘাটের নৌকাখানাকে এনেছে তার খামার বাড়ির নীচের জলায়, বদন ডাক্তারও বানের আগে খড়কুটোর মত এসে জুটেছে। আরও দু-চারজনের জুটতে দেরী হয় না। গেণু দাস বলে—নশীপুর, দে গাঁ মদনপুরের দিকে চলে যাও ডাক্তার। জলবন্দী লোকদের তুলে আনতে হবে। আর নটবর, তুমি কয়েকজনকে নিয়ে শালের কড়াই ক'খানা নামিয়ে চলে যাও এদিক-ওদিকের গাঁয়ে। তবু কাছাকাছির মানুষজনকে নিয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। ওদের বাঁচানো চাই।

কেতুলালকে কোন রকমে ওরা নদী পার করে সদর রাস্তায় তুলে দিয়েছে। কেতুলাল এখানের মানুষের প্রতিনিধি। সে এবার ছুটে চলেছে সদর হয়ে কলকাতার দিকে। সামনে তার অনেক কাজ, তার মাথায় অনেক বড় দায়িত্বের বোঝা এসে পড়েছে।

গেণু দাস যেন দাবার ছক সাজিয়ে বসেছে। আর এক একটা ঘুঁটির চাল দিচ্ছে। ওর ধীর স্থির পদক্ষেপ ধরা পড়ার মত নয়। কিন্তু সব কিছুই যেন তার নখদর্পণে ফুটে উঠেছে।

…এর মধ্যে ওই টিলার ঘরগুলো –বিরাট স্কুলবাড়ি—হোষ্টেলের দিকে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ ওই গুড়ের কড়াই ভাসিয়ে, না হয় হেঁটে, সাঁতরে, কেউ বা নৌকায়, না হয় কলাগাছের ভেলায় করে সামান্য সম্বল নিয়ে এসে উঠেছে, আরও অনেকে আসছে। সব তাদের ওই সর্বনাশা বানের তোড়ে আজ ভেসে গেছে।

বাঁধ থেকে অবিনাশ কোন রকমে গ্রামে এসে ঢুকেছে, তখন গ্রামের পথে জল এসে পড়েছে। পথে স্রোত বয়ে চ'লেছে। তার বাড়িটা তবু বেশ খানিকটা উঁচুতে, এর মধ্যে গ্রামের লোকজন গরু-বাছুরগুলোকে এনে হাজির করেছে সেই উঁচু টিলার উপর। কেউ হাঁটু জল, কোমর জল ভেঙ্গে বাচ্ছা মেয়েদের এনেছে। কলরব দৌড়াদৌড়ি সুরু হয়েছে। যতিলালের কাঠবিড়ালীর মত বউটা খর-খর করে লক্ষ্মীর হাঁড়িটা নিয়ে দৌড়চ্ছে। যতিলাল গর্জায়ঃ

ফেলে দে—উ হাঁড়ি। চালের হাঁড়িটা লিয়ে চল তবু দুদিন সিজিয়ে খাবি।

বৌটা গজগজ করে—ঘরের লক্ষ্মী।

—নিকুচি করেছে তোর লক্ষ্মীর। ফ্যাল উসব্!

যতিলাল আজ স্রেফ বাঁচার পাথেয়টুকু নিয়ে সরে আসতে চায়। গরু-বাছুরগুলোও গোয়াল থেকে খোলা পেয়ে ল্যাজ তুলে দৌড়চ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। অজানা ভয়ে ওদের কালো ডাগর চোখে ফুটে উঠেছে বিস্ফারিত চাহনি।

টিয়াও দেখেছে সারা গ্রামের মানুষের চোখে কি আতঙ্কের ছায়া। ও এমনি দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। সহরে এসব ঘটে না। এই মাটিতে এসে এতদিন ধরে টিয়া অনেক বঞ্চনা, অনেক অবজ্ঞা সহ্য করেছে। তিলে তিলে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ওর সারা

মন। কিন্তু আজকের এই সর্বনাশ তাকে বিচলিত করেছে। অবিনাশও পাড়ার দিকে উদ্ধার করতে গেছে।

সকলেই এসেছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় তাদের এই উঁচু ঢিবির আশেপাশে। জানে না,—টিয়া এখানে জল ঠেলে আসবে কিনা, তবু মনে হয় অবিনাশ তার জন্য এতটুকু ভাবে না, না হলে এতবড় বিপদের সময়েও সে ফেরেনি কেন? হয়তো তাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে সরে গেছে অবিনাশ। টিয়ার সারা মন কি এক ভয় আর চাপা রাগে ফুঁসে উঠেছে। তার করার কিছুই নেই।

এমন সময় জলকাদা মাখা অবস্থায় অবিনাশকে ফিরতে দেখে টিয়া ফুঁসে ওঠে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অবিনাশের সারা মনে ব্যর্থতার জ্বালা। দেখেছে অবিনাশ ওই বাঁধটাকে কারা ইচ্ছে করেই অবহেলা করে ফেলে রেখেছিল, আর বানের প্রথম আঘাতেই সেটা চুরমার হয়ে গেছে—তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। টিয়ার কথায় চাইল অবিনাশ। কথা কইবার মত সামর্থ্যও তার নেই।

টিয়া বলে—সবাই ঠাঁই নিচ্ছে এখানে ওখানে, আমাদের কি হবে?

অবিনাশের মনে হয় ভয়ই পেয়েছে টিয়া, তারও ফিরতে দেরী হয়ে গেছে। ও জানে না কিছু। তাই টিয়ার ওই মন্তব্যে রাগ করতে পারে না অবিনাশ। বলে সে—এখানটা অনেক উঁচু। জল বোধহয় এতটা আসবে না, এলেও বেশী হবে না। এখানেই থাকবো।

টিয়া আর্তকণ্ঠে বলে—এখানেই পড়ে থাকতে হবে? চারিদিকে শুধু জল আর জল! এখানে থাকবো কি করে?

অবিনাশও জানে সেটা। তাই বলে—এছাড়া পথ নেই রে।

গুমরে ওঠে টিয়ার মন। আজ মনে হয় তাকে ওই অবিনাশ জোর করে এখানে বন্দী করে রেখেছে কি এক কঠিন শাস্তি দেবার জন্যই।

টিয়া বলে ওঠে—এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে জলে ডুবে মরাই ছিল ভালো। এর নাম বেঁচে থাকা!

টিয়ার কথায় চাইল অবিনাশ। টিয়ার এই বিদ্রোহিনী মূর্তিটাকে আজ যেন নতুন করে দেখেছে অবিনাশ।

কানে আসে অনেকের কলরব, সারা গ্রামের মানুষের আর্তনাদ শোনা যায়। ওদের জন্য কোন সমবেদনাও নেই টিয়ার।

ও যেন এ মাটির কেউ নয়। এদের বিপদে সে মুহ্যমান নয়।

রাত ঘনিয়ে আসে। উঁচু ভিটের নীচে এসে জল ঠেকেছে। আর আকাশের বৃষ্টিও চলেছে সমানে। ওই মানুষ, গরু-বাছুরগুলো এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছে। খাবার কথাও কারো মনে নেই যেন! ছেলেগুলো ককিয়ে কেঁদে ওঠে। সব ছাপিয়ে কানে আসে ওই বাঁধভাঙ্গা জলপ্রবাহের মত্ত গর্জন। দূরে দেখা যায় নশীপুরের টিলার উপরের স্কুলবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়টা, দু'একটা আলো জ্বলছে সেখানে কি আশ্বাস নিয়ে।

এখানে আবছা অন্ধকারের মাঝে দু'একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গুণছে ওই অসহায় মানুষগুলো।

টিয়ার দু'চোখে নেমেছে জমাট আতঙ্কের স্তব্ধতা। শুকনো ডাঙ্গাটায় হঠাৎ একটা সাপ দেখে চীৎকার করে ওঠে টিয়া। জল থেকে উঠে সাপটা এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে এইদিকে আশ্রয়ের সন্ধানে।

টিয়ার চীৎকারে সাপটাও ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় এবার এগিয়ে এসে এক ঝটকায় তার উপরই পড়বে। অবিনাশ ছুটে এসেছে। হ্যারিকেনের সামনে সাপটা ফণা নামিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়েছে। ওর যেন আক্রোশ নেই—ও আজ আশ্রয় চায়। অবিনাশ বলে—সরে আয় টিয়া। ও কিছু বলবে না.

টিয়ার সাধ্য নেই নড়ার। ও ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

অবিনাশই ওকে ঘর থেকে বের করে আনে এদিকের ফাঁকা চালায়, যতিলালের বৌ—মহিনের মা, আরও অনেকে রয়েছে।

সেখানেই এসেছে টিয়া—সেই মুহূর্তে ওই উত্তুরের পুরোনো মাটির বাড়িটা সশব্দে ধসে পড়লো—পোঁতায় জল লেগেছিল, ভিজে ভিজে দেওয়ালটা জীর্ণ হয়ে এই মুহূর্তেই ধসে পড়েছে ওরা বের হয়ে আসার পরই।

চমকে ওঠে টিয়া। ও যেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। ভয়ে শিউরে ওঠে সে। অবিনাশও অবাক হয়, তার ওই ঘরটাও আজ অতীতের সব স্মৃতির একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে। ওরা ভিজছে,—নিরাশ্রয় ওই জীবগুলো। এই কালরাত্রির যেন শেষ নেই। এর প্রতিটি দণ্ড প্রহর ওদের দেহে মনে এনেছে কঠিন একটা চাপ-জমাট আতঙ্ক। ওরা কোন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের অতলে হারিয়ে গেছে।

জমাট অন্ধকারে টিয়ার সব সহ্যশক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে. কি অসহায় কান্নায় টিয়া ভেঙ্গে পড়ে।

জল আর জল। ধানক্ষেত, আখের জমি, সবুজ তরিতরকারীর ক্ষেত সব ডুবে গেছে, মাঝে মাঝে আখের ডগাগুলো দেখা যায় তখনও নড়ছে বাঁচার চেষ্টায়।

চরের বাবলা গাছের ডালে ডালে সাপগুলো জড়িয়ে রয়েছে, নীচে দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। গেরুয়া জলের স্রোত।

প্রভাতবাবুরাও চেষ্টা করেছে অসহায় জলবন্দী মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য। ওরা বুঝতে পেরেছে সর্বনাশ ঘটে গেছে। তাই প্রভাতও রাতের বেলাতেই গেছে গেণু দাসের ওখানে। কেতুলাল, গেণু দাস দুজনেই রয়েছে। আর এসে জুটেছে বদন ডাক্তার।

হঠাৎ রাতারাতি সে-ই লীডার বনে গেছে। ততক্ষণে হাঁক-ডাক করে নৌকা নামিয়েছে। বদন বলে ওঠে প্রভাতের উত্তেজিত কথাগুলোয়ঃ

—ওসব কি আমরা ভাবছি না মাষ্টার? নৌকা বের হয়ে পড়েছে। গুড়ের কড়াইও নামিয়েছি খান আট দশ, কাজ সুরু করে দিয়েছেন গেণুবাবু।

কেতুলাল এদের সামনে অন্য মানুষ। গেণুবাবুর সামনে সে শিক্ষার্থী মাত্র, হয়তো বা গেণুবাবুর দাবার ছকে ঘুঁটি সে। ওর পরামর্শমত পা ফেলে। সেটা ভিতরের খবর। কিন্তু অন্য লোকের সামনে কেতুলালের ভিন্ন মূর্তি। গ্রামের কিছু লোকজন, স্কুলের অন্য মাষ্টারদের নিয়ে এসেছে প্রভাতবাবু ওদের সাহায্যের ব্যাপারে। কেতুলাল সিগ্রেট ধরিয়ে বলে :

—আমরাও বসে নেই প্রভাতবাবু, এই অবস্থার মধ্যে যেটুকু করা যায় করছি। আপনারাও আসুন। স্কুল-হোষ্টেলে ওদের জায়গা দিন। আমি কাল সকালেই সদরে চলে যাচ্ছি, দরকার হয় কলকাতায় মিনিষ্টারের ওখানেও যাবো। যা করার করবোই। কোন ত্রুটি হবে না আমাদের তরফ থেকে।

আর গেণুবাবু!

গেণু দাস দেখছে কেতুলালের ওই বাচনভঙ্গী। কেতুলাল বেশ তৈরী হয়েছে। পরের চালটাও জানে গেণু দাস। ও নিজে কেতুলালকে তালিম দিয়েছে যে। কেতুলাল বলে ওঠে গেণুবাবুকে।

—অন্তত রিলিফ আসার আগের কয়েকদিনের জন্য আপনাকে কিছু চাল-ডাল-কুমড়ো দিতে হবে। লোকগুলোর একবেলার খাবারও চাই। এ আমাদের দাবী।

প্রভাতবাবুও এইটা নিয়ে ভেবেছে। জানে বন্যার্তদের অবস্থা, ওদের অনেকে না খাটলে খেতে পায় না। এখন কাজ কে দেবে তাদের। তাই উপবাস ছাড়া পথ নেই। প্রভাতও বলে :

—তারও বেশী দরকার গেণুবাবু।

গেণু দাসের মা-লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অফুরান। ধান-চাল তার বেশী রয়েছে সহরের ধানকলের গুদামে। তবু এখানে যা আছে তাও কম নয়।

ডাল-কুমড়ো তার ক্ষেতের। কুমড়োর পাহাড়ই রয়েছে। সব এখনও ট্রাকবন্দী করে চালান দিতে পারেনি। গেণুদাস তবু অসহায়ভাবে বলে—এত কোথায় পাবো মাষ্টার?

এবার কেতুলাল জানায়—আপনার কাছ থেকে আগাম কিছু নোব। আপনি এই এলাকার বড় জোতদার! আপনি, নিমাইবাবু, হলধরবাবু, দেগাঁয়ের সাঁপুইমশায় এদের সকলের কাছ থেকেই কিছু নিতে হবে আমাদের। লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে। কি বলো মাষ্টার?

প্রভাতও বুঝেছে ওদের সাহায্য নিতেই হবে। আর গেণু দাস দেখছে প্রভাতবাবুকে। ছোকরার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে, দেখেছে এ এলাকার সাধারণ মানুষের চোখে নীরব সেই জ্বালা আর প্রতিবাদের কাঠিন্য। ওরা তার এতকালের সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরিয়েছিল, ওদের সমবেত আঘাতে তাদের এতদিনের সাজানো প্রাসাদ তাসের ঘরের মতই ঝুর-ঝুর করে ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আজ! দিন বদলেছে।

গেণু দাস বুঝেছে ওদের সাহায্য ছাড়া বাঁচার পথ ওই হাজার হাজার মানুষের নেই। ওদের এই দুর্ভাগ্যকে পুঁজি করেই গেণু দাস-এর দল আবার তাদের ইমারতের ভিতটাকে শক্ত আর মজবুত করে তুলবে। আর সামান্য যেটুকু যাবে তাদের ভাণ্ডার থেকে, সেটা কয়েক গুণ হয়ে ফিরে আসবে। সব তুলে নেবে গেণু দাস। তবু সহজে রাজী হয়ে তাদের স্বার্থের স্বরূপটাকে জানাতে চায় না, গেণু দাস জানায়ঃ

—এত বড় সাধ্য আমার নাই মাষ্টার মশাই। দিয়ে থুয়ে শেষকালে বদনামের ভাগী হতেই বা কে চায় বলুন? অবশ্য হলধরবাবু, সাঁপুইমশায়, নিতাইবাবু ওঁরাও যদি এগিয়ে আসেন আমরা যথাসাধ্য করবোই। দাঁড়িয়ে এতবড় সর্বনাশ তো দেখতে পারি না। হাজার হোক আমারই প্রতিবেশী তারা। তারা সেটা মানুক না মানুক আমাদের কিছু করতেই হবে। চুপচাপ বসে দেখতে পারি না।

বদন ডাক্তার মাথা নাড়ে—ঠিক কথা। তবে জানো মাষ্টার, যতই করো ওদের, ও ব্যাটারা সব বেইমান। সব ভুলে যাবে।

এই আমিই কতো চিকিচ্ছে করেছি ওদের, পাই পয়সা তো দেয়নি, আড়ালে বলে, শালা গোবদ্দি! আরও কতো কথা।

বদন বলে চলেছে—তবু থাকতে পারিনি, ওদের বিপদে ছুটে এসেছি। তাই বলছিলাম দাস মশাই—যতই বলুন, আপনি সরে থাকতে পারলেন? পারলেন না।

—কইরে, ওদের নিয়ে ইস্কুলের চালায় তোল গে। অ ক্ষুদিরাম!

দলবেঁধে কারা বানের জল পার হয়ে এসেছে। বদন ওদের ব্যবস্থা করতে চললো হাঁক-ডাক করে।

…সকাল হবার মুখেই নৌকাটা এসেছে একেবারে অবিনাশের খিড়কীর পুকুরের ঘাটে। মাঠ-ঘাট সব একাকার হয়ে গেছে। জল এসে ওদের চাটান ছুঁয়েছে। সারারাত জেগে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে তারা। টিয়ার চোখে মুখে ভয়ের ছায়া, মুখ বন্ধ করে বসে আছে সে। এমন সময় দেখা যায় নৌকাটাকে।

বদন ডাক্তারও রয়েছে তাতে—কইরে, সব ঠিক আছিস তো?

বদন ডাক্তার আজ ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে এসেছে। অবিনাশ চাইল ওর দিকে। বদন এনেছে মুক্তির আশ্বাস। ওখানে গেলে আশ্রয় পাবে, খেতে পাবে তারা যা হোক কিছু। বদন বলে:

—চল! মেয়েছেলেদের আগে পৌঁছে দিয়ে আসি নশীপুরের ক্যাম্পে।

মতিলাল বলে—তাই ভালো।

নকড়ি বসেছিল একটা পৈঠার উপর। কাপড়টা জল-কাদায় ভিজে।

ন'কড়ি বলে—তাই যা বউ। কি রে অবিনাশ—ওরা ওখানেই যাক! এ্যাঁ?

অবিনাশ ভেবেছে কথাটা। বান কমছে। এবার জল সরে যাবে। আর গেণু দাসের আশ্রয়ে যেতে মন চায় না তার।

তাই বলে—বান তো কমে আসছে রে, কেন যাবি? আবার তো ফিরতে হবে এখানেই।

ন'কড়ি বলে—তাই ভাবছি।

বদন ডাক্তার জানে, এরা ঠিক রাজী হবে না যেতে। তবু বলে :

—এখানে খাবার জল পাবি না। শেষকালে মড়কে মরবি ?

টিয়াই শুনেছে ওদের কথা। এখানে দেখেছে সে তিলে তিলে অনেক অপমৃত্যুকে। কাল রাত থেকে তার দেহমনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে চলেছে। অনেক সয়েছে মেয়েটা। কাল রাতে সাপের ছোবল খেতে খেতে বেঁচে গেছে। তারপরই ওই আশ্রয়টুকুও ধসে পড়েছে। ঝুলছে ঘরখানা। এই চালায় পড়ে থাকতে হবে তাদের। টিয়া অবিনাশের এই জেদটার আজ প্রতিবাদ করে। ও বলে ওঠে—এখানে থাকবো না। কিগো খুড়ি, যাবে তো ?

গিরিবালাও দেখেছে সব। রাত থেকে বুড়ি জলে ভিজে কাশছে। যতিলালের বৌটা লক্ষ্মীর হাঁড়ি জলে ভাসিয়ে বের হয়েছে, ওদের কাছে লোকগুলোর এই জেদ বিশ্রী লাগে। ন'কড়ির ছেলেটারও জ্বর। গিরিবালাই বলে—তাই আমিও বলি বাপু, থাকতে হয় তোরা থাক। মেয়েছেলেগুলোকে পাঠা। ইখানে থাকলে জ্বর জ্বালায়—না খেয়ে আর জলে ভিজেই মরতে হবে খামোকাই।

অবিনাশ টিয়ার দিকে চাইল। মেয়েটা আজ জলে ভিজে অনেকটা বদলে গেছে। সামনে দেখেছে সর্বনাশা বিপদ, তাই টিয়াও তার মনস্থির করে ফেলেছে। ও বলে অবিনাশকে :

—ওখানে না পাঠাতে চাও, তাহলে সহরে বাবার কাছেই পাঠাও।

—এখন কি করে হবে! পথঘাট সব বন্ধ। নদীতে খেয়া নাই।

অবিনাশ জবাব দেবার চেষ্টা করে। টিয়া দৃঢ়স্বরে বলে—তাহলে গিরিখুড়িদের সঙ্গেই যাবো আমি। এখানে থাকতে পারবো না। থাকবো না।

অবিনাশ দেখছে ওকে। আজ টিয়ার মুখচোখে ফুটে উঠেছে কি কাঠিন্য। ও যেন চরম পথই নিতে চায়। গিরিবালা বলে :

—তাই চলুক অবা। বৌটার কি হাল করেছিস বল? বেচারা একা একা পড়ে থাকবে ইখানে? আমরা সবাই যেছি।

অবিনাশও কথাটা ভাবে। মেয়েদের অনেকেই চলে যাচ্ছে ওই স্কুল বাড়ির আশ্রয়ে। তাই অগত্যা সেও রাজী হতে বাধ্য হয়। দেখছে অবিনাশ টিয়াকে। মুখচোখে নীরব প্রতিবাদের জ্বালাও যেন ফেটে পড়বে এইবার। টিয়াও বদলে গেছে এই কষ্টে দুঃখে। অবিনাশ যেন হেরে যাচ্ছে। চুপচাপ থেকে অবিনাশ বলেঃ

---ঠিক আছে। যা।

ওরা চলেছে নৌকায়: এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। চারিদিক শুধু জল আর জল। দূরে গ্রামগুলো ওই জলে ভাসমান এক একটি দ্বীপ। ঘরের চাল-কাঠ-বাঁশ-হাঁড়িকুড়ি ভেসে চলেছে। টিয়া দেখছে ওই সর্বনাশকে। এখানের উপর এই মানুষগুলোকে যেন সে সইতে পারছে না। বদন ডাক্তারের হুঁশিয়ারী শোনা যায়:

---জোরে বাইবি ভজা, সামনে ভাঙ্গলার স্রোত। ওরা এগিয়ে চলেছে ওই উঁচু গ্রামের দিকে। ইস্কুল বাড়ির বিরাট সাদা দেওয়াল-গুলো ঝকঝক করছে বৃষ্টি ধোয়া রোদে কি নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে।

গেণু দাস অবশ্য এর মধ্যে নিতাইবাবু, হলধরবাবু, সাপুই মশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছে। প্রভাত-বাবুদেরও হাত লাগাতে হয়েছে। স্কুলের মাঠেই বড় বড় উনুন পেতে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। বিরাট মাঠে বসে পড়েছে ওই হাজারো অসহায় মানুষ—মেয়েছেলের দল। গেণু দাস নিজেও আসে তদারক করতে। ওই অসহায় মুখের ভিড়ে সে খুঁজছে সেদিনের তেজী মানুষগুলোকে। তাদের অনেকেই নেই। ওরা কলরব করে খেতে বসেছে। কয়েকদিনই খায় নি তারা। বুভুক্ষুর দল খেয়ে চলেছে।

টিয়ার এসব ভালো লাগে না। সকলের সঙ্গে একটা ঘরে বদ্ধ হয়ে আছে। শোবার জায়গা নেই। তাড়াতাড়িতে খানদুয়েক

শাড়ি জামা মাত্র এনেছে। এমনিতে টিয়া একটু সৌখীন। তাদের সংসারের দায়দায়িত্ব—ঘটা তত নেই। আর নিজের দুধের যোগানের টাকা থেকে সে কিছু খরচা করে নিজের জন্য। এখানের এই জীবনে সে অভ্যস্ত নয়। আর খেতে গিয়ে ওই কাঙ্গালী ভোজনের মত ব্যবস্থা, অবশ্য এ ছাড়া করার কিছু নেই। তবু সইতো, কিন্তু মানুষ-গুলোর এই কাড়াকাড়ি আর চিৎকারটা তার বিশ্রী লাগে। পাতা পেতে ওরা চিৎকার করছে—আমাকে দাও। আরো দাও গো, অ বাবু!

যেন বেশী খিচুড়ি না দিলে ওরা খাবলে কেড়ে নেবে বালতিটা। কেউ হাতই দিয়েছে।

পরিবেশনকারীরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তাই রাগের মাথায় হাতা দিয়েই পিটিয়েছে সে। তাই নিয়েই কলরব ওঠে। অবশ্য দু'হাতা খিচুড়ি পেতে সেও থেমে যায়। গোগ্রাসে গিলছে সেটা।

টিয়া ওই বুভুক্ষুদের লাইনে বসে ওইভাবে খেতে পারে না। তার কেমন বাধো বাধো ঠেকে। গিরিবালা অবশ্য দলবল নিয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে বসে পড়ে তাড়া দেয়—অ টিয়া, বসে যা। নইলে জায়গা পাবি না লা।

গলা নামিয়ে যতিলালের কাঠবিড়ালীর মত বৌটা জানায়ঃ

—সব শেষ হয়ে যাবে, যা পাত পড়েছে। এই বেলা বসে পড় টিয়া।

টিয়া বসেনি। মনে হয় একবেলা চিড়ে এনেছে তাই চিবিয়েই কাটাবে এর চেয়ে। তাই বলে টিয়া—আমি খাবো না পিসী, শরীরটা ভালো নাই।

গিরিবালার এদিকে কান দেবার অবসর নেই। তখন খিচুড়ি আর এক হাতা পাবার জন্য চিৎকার জুড়েছে।

—ওগো, আরও একটুন দাও গ। এই ছেলে।

গেণু দাস ওই বিভিন্ন পংক্তিতে খুঁজছে সেই দিনের মানুষ-গুলোকে, তার বড় ইচ্ছে হয় তাদের এখানে ওইভাবে দেখতে।

কিন্তু হতাশই হয়েছে সে। অবশ্য গেণু দাস সে কথাটা প্রকাশ করেনি। ও এসেছে এবারের তদারক করতে। পাশে রয়েছে বদন ডাক্তার। বদন ক'দিনই দাসমশাই-এর শ্রীঅঙ্গে এঁঠুলির মত লেগে গেছে, আর দাসমশাইও তার এলেম দেখে মনে মনে খুশী হয়েছে।

গেণু দাস শুধোয়—সবাই এসেছে হে? উত্তর নশীপুরের অবিনাশ—ন'কড়ি, দেগাঁয়ের যতিলাল—জগন্নাথপুরের ফটিকচাঁদ—এদের তো দেখছি না?

বদন বলে—আজ্ঞে আমি নিজে গেছি ওদের গাঁয়ে। আবার গেছে নৌকো নিয়ে ছেলেরা। ওরা সব্বাই আসেনি।—গাঁঘরে তবু কিছু আছে। সব্বাই এলে আর ঘরে কিছু থাকবে না। তাই অবিনাশ-ন'কড়িরা গাঁয়ে রইল।

গেণু দাসের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটা আওয়াজ বের হয়ঃ

—হুঁ।

বাকী কথাটা বলে না। তবে মনে হয় গেণুবাবুর যে ওরা ইচ্ছে করেই আসে নি। তাদের কোন সাহায্য হাত পেতে নিতে তারা চায় না এটাই বোঝাতে চায় তারা।

বদন নিজের ক্ষমতার কথাটা জানাতে চায়। তাই বলেঃ

—তবে ওদের বাড়ির মেয়েরা এসেছে। ওই তো—অবিনাশের বৌ।

টিয়া খেতে বসেনি। ও চলে আসছে ঘরের দিকে। বদ্ধ ঘরটায় জমেছে বহু মানুষ, কেমন বিশ্রী চিমসেনি গন্ধ ছাড়ছে। তবু ওখানেই ফিরে যাবে টিয়া। রাগ হয় অবিনাশের উপর। লোকটা তাকে তবু সহরে বাবার ওখানে পাঠালো না। সম্মানে বাধে নাকি তার। মান সম্মান! সব ওই বানের জলে ভেসে গেছে। আজ ঘরখানাও পড়ে গেছে—খাবারও তেমন কিছু নেই। সারা মাঠের ধান—ফসল সব হারিয়ে গেছে। তবু তার বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবে না সে। তার ইজ্জত চলে যাবে। টিয়ার সারা মনে একটা জ্বালা ঘনিয়ে আসে।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। টানা লম্বা বারান্দাতেও মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। ছেঁড়া চট-পুঁটলির গাদা জমেছে সেখানে।

লোকগুলো এখন সবাই গিয়ে পড়েছে ওই খিচুড়ির পাতে। বারান্দাটা নির্জন। হঠাৎ কার ডাকে চাইল টিয়া!

বদন ডাক্তার ডাকছে তাকে। পিছনে রয়েছে গেণু দাস। গেণু দাস এসেছে এখানে ওদের থাকার জায়গাগুলোর তদারক করতে। টিয়া দাঁড়ালো। গেণু দাস যেন হঠাৎ দেখে ফেলেছে তাকে। বদন ডাক্তার শুধায়—তুমি খেলে না?

গেণু দাসও দেখেছে তেজী মেয়েটা পাতে বসেনি, উঠে চলে এসেছে। আর ওই তেজোদৃপ্ত রুক্ষ চেহারাটা গেণু দাসের চোখে একটা নেশা এনেছে। টিয়া জানায়—শরীর ভালো নেই।

গেণু দাসই বলে ওঠে—এভাবে থাকা খাওয়া সত্যি কষ্টকর। দেখছো তো এত লোক এসে পড়েছে। আর ক'দিনই বা জোটাতে পারবেন এঁরা জানি না। অবিনাশ আমার খুবই কাছের মানুষ। এক লপ্তে অনেক জমির চাষী। তাই বলছিলাম—তুমি বরং আমাদের ওখানেই থাকতে পারো। মানে অন্য সব কাজের লোকজন তো আছে --মেয়েরাও আছে বার বাড়িতে। সেখানেই থাকবে।

বদন ডাক্তারই বলে ওঠে—ওর মহাভাগ্যি বড়বাবু! সারামাস থাকবে সেখানে। তাই থাক!

টিয়া কি ভাবছে। অবিনাশ তার খোঁজ-খবরও নেয়নি। কোন-মতে ঘাড় থেকে তাকে নামিয়ে খালাস হয়েছে। কাল থেকে এখানে পড়ে আছে টিয়া—তবু বাবার ওখানে যেতে দেয়নি অবিনাশ। টিয়া আজ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই করতে চায়।

গেণু দাস ওকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু নিরাশই হয়। তাই বলে—অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে আলাদা কথা। তবে তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম। আর অবিনাশ যখন জানবে আমি তোমাকে ঠাঁই দিতে চাইনি সেও কষ্ট পাবে।

টিয়া মনে মনে হাসলো। তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গের হাসি।

গেণু দাসের কথার স্বরে ওই আত্মীয়তার ভাবটা তার কাছে চাপা থাকেনি। সেই ঝড়ের রাতের দৃশ্যটা মনে পড়ে। ওর চোখে দেখেছিল টিয়া অন্য এক চাহনি, তার অর্থ সে চেনে। আজ আবার ওই আমন্ত্রণটা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তবু মনে হয় টিয়ার অবিনাশের কাছে তার দামটা জানানো দরকার। চাপা রাগ-অভিমান সব মিশে টিয়ার ভাবনাগুলো আজ অন্য পথে চলেছে। টিয়া বলে ওঠে ঃ

—অসুবিধার কথা নয় দাসমশাই। অসুবিধেয় ফেলেছি আপনাদের। এত ঝামেলা নিয়ে রয়েছেন, আবার আমি ঝন্‌ঝাট বাড়াবো ?

বদন দত্ত বলে ওঠে—আর বড় গাছেই ঝড় বাধে অবিনাশের বৌ। এসব সওয়া গেণুবাবুর অব্যেস আছে। দেখ না—দানছত্র খুলেছেন।

গেণু দাস দেখছে মেয়েটাকে। বেশ সহজ আর ধারালো। গেণু দাস বলে—অসুবিধা কি হবে ? তাহলে বদন ওকে নিয়ে যাও ও বাড়িতে। আর কেষ্টোর মাকে বলে দিও, ওপাশের ঘরে অবিনাশের বৌ থাকবে। ওর খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেবে। যাই আমি আবার দেখে আসি এখানের ভাঁড়ারটা। কি আছে না আছে দেখি।

গলা তুলে ব্যস্ততার ভান করে গেণু দাস হাঁক দেয়—অধরকে একবার ডেকে দে কে আছিস আর প্রভাতবাবুকেও। ভাঁড়ার ঘরের চাবি নিয়ে আসুক।

টিয়া কি ভাবছে। এর মধ্যে ওর ঘর থেকে তার পুঁটলিটা কে বের করে এনেছে। টিয়ার মনে হয় জীবনের একটা নোতুন ধারাকেই দেখবে সে। কি রুদ্ধ অভিমানে টিয়া আজ গেণু দাসের আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছে, যার সামান্য মাত্র দয়া অবিনাশ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইজ্জত।

টিয়া আজ ওগুলোকে অর্থহীন, তুচ্ছ বলেই ভাবে। তাই আজ সে নিজের মতেই চলেছে ওই নোতুন আশ্রয়ে।

খবরটা গিরিবালাও শুনে গুম হয়ে যায়। ওরা খেয়েদেয়ে আর গেলাসে বাড়তি খিচুড়ি কোনরকমে তুলে নিয়ে এসেছে। রাতে খাবার ব্যবস্থা নেই—তাই কোনরকমে কিছুটা ওই লপ্‌সি তুলে এনেছে। ঘরে পা দিতেই দেগাঁয়ের এক বুড়ি জানায়—অবিনাশের বৌকে দেখলাম বাবুরা খাতির করে নে গেল নিজের বাড়িতে, ওর থাকা-খাওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হবে শোনলাম।

গিরিবালা অবাক হয়—তাই নাকি!

খিক্ খিক্ করে নকড়ির বৌটা হেসে ওঠে। ধমক দেয় গিরিবালা।

—হাসছিস কেনে লা?

—মেয়েটা বলে ওঠে—তা বাবুর নজরে ধরেছে নাকি গ? পলাশ ফুলের মতন বাহার তো আছে, আর দিনরাত সেজে-গুজে পরীটি হয়ে থাকে। বাবুদের দোষ কি বলো?

গিরিবালা জবাব দিল না। কে বলে ওঠে:

—তা বাছা, বাবুরা ছিল বলে বানের মুখ থেকে বেঁচে এয়েছি। দুমুঠো খেতে পেছি। উ কথা কেন বলো বাপু! শোনলাম নিজের খাস চাষীর ঘরের বৌ—ঘরে ঠাঁই দিলেই দোষ?

নকড়ির বৌটা থেমে গেল। বুঝেছে এখানে প্রকাশ্যে এসব কথা বললে বিপদই হবে। বাবুদের কানে গেলে আরও মুশকিল বাড়বে। তাই চেপে গিয়ে ঘরে ঢুকলো তারা।

গিরিবালা চাপা গলায় বলে,—ইসব কথা এখন বলিস না ভাদু। শুধু দেখে যা।

অর্থাৎ এর বিহিত পরে করবে ওরা। এখন সময় সুযোগ আসেনি। তারই প্রতীক্ষায় থাকবে তারা। তবে টিয়ার সম্বন্ধে দুচারটে মন্তব্য এরা না করে পারেনি। গিরিবালাই বলে:

—তখনই বলেছিলাম অবা'কে সহর বাজারের নাচুনী মেয়েকে ঘরে আনিস না। তা কে শোনে কার কথা! এখন আট্‌কা! বুঝবি ঠ্যালা।

কেতুলাল জানে সামনেই এগিয়ে আসছে ভোটের দিন। এখন থেকেই তাদের দলকে তৈরী হতে হবে। এই এলাকাতেও তাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম থাকা দরকার। আর এমনি বন্যা-দুর্ভিক্ষ এলে তাদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা সহজ। অভাব আর অনাহারের মধ্যে কষ্টের মধ্যে নিঃস্ব মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের কিছুটা মাত্র হাতে এলেই তারা খুশী হয়। আজ এই এলাকার মানুষের দরকার মাত্র দু'মুঠো ভাত আর একটু আশ্রয়ের। তারপর চাষ-এর সব পুঁজি ধান, ফসলও চলে গেছে। ওদের সামনে অন্ধকার নেমেছে। তাই কেতুলাল সমস্ত ব্যাপারটা কর্তাদের জানাতে তাঁরাও এগিয়ে আসেন। তাছাড়া সরকারী ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

খবরের কাগজের লোকজনদের নিয়ে আর সাহায্যের হুকুম সমেত কেতুলাল এসেছে সদরে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য এর মধ্যেই এসব এলাকা দেখে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। গেণু দাসের এই স্কুলের লঙরখানা আর বিস্তীর্ণ এলাকার সব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জেনে গেছেন। তাই রিলিফও আসতে সুরু করেছে এবার উপর থেকে।

গেণু দাস আজ মনে মনে খুশী হয়েছে। ক'দিন ধরে হঠাৎ তার নামডাকও বেড়ে গেছে এই এলাকায়। ওই আশ্রিতদের চোখে সে যেন দেবতা। অনেক বুড়ি আশীর্বাদ করে—রাজা হও বাবা।

অবশ্য রাজা হবার দিন আর নেই। রাজত্ব চলে গেছে। সে খবর ওরা জানে না। তাই ওই আশীর্বাদ করে। জয়ধ্বনি দেয়।

প্রভাতবাবু দেখেছে সবকিছুই। অসহায় ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ-গুলোর এই দুর্ভাগ্যকে নিয়ে গেণু দাসও বেসাতি সুরু করেছে। তবু দেখেছে প্রভাতবাবু কিছু মানুষকে। তারা এখানে আসেনি গেণু দাসের কাছে মাথা বিকিয়ে দিতে। তাদের মধ্যে অবিনাশকেও দেখছে সে।

পরদিন বন্যার তোড় একটু কমলেও তখনও নৌকাতেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রভাতবাবু জানে ওরা অনেকে আসেনি। কি অবস্থায় মরছে লোকগুলো জানে না সে। তাই নিজে থেকেই ভাঁড়ার

থেকে কিছু চাল-ডাল-আলু চিঁড়ে-গুড় নিয়ে বের হয়েছিল নৌকায় করে ওদের গ্রামের দিকে।

অবিনাশ-নকড়ি-ক্ষুদিরাম-যতিলাল আরও অনেকে ওই ভাঙ্গা বাড়ির এদিক-ওদিকে বসে আছে। জল কমছে কিন্তু একেবারে নামেনি তখনও। ওরা যেন শ্মশানপুরীতে বসে আছে। স্তব্ধপ্রায় গ্রাম —একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ওই ক'টি মানুষ যেন সব শেষ করে এবার বসেছে। যতিলাল বলে—ভাতে ভাত রাঁধবো গো?

অবিনাশের মনটা ভাল নেই। টিয়া যে তার উপর রাগ করেই চলে গেছে তা বুঝেছে। যতিলালের বাড়ির সকলেই গেছে, ওর বোন মতি বলেছিল—ইখানে পড়ে থেকে কি করবে?

অবিনাশ মতির দিকে চেয়ে থাকে। মতির জীবনে ঘর-সংসার হয়নি। বিয়েও হয়েছিল কবে জানে না সে, তখন থেকেই যতিলালের বাড়িতে পড়ে আছে মেয়েটা। দেহে যৌবনের ব্যর্থ সাড়া। একদিন অবিনাশ হয়তো স্বপ্ন দেখেছিল ওকে কেন্দ্র করে, কিন্তু সে স্বপ্নই রয়ে গেছে।

মতি বলে—কেন যাবে না তা জানি। তা ইস্কুল তো পঞ্চজনের। ওই গেণু দাসের তো নয়? যেতে দোষ কি সেখানে?

অবিনাশ বলে—তোরা তো যাচ্ছিস। আমরা এখানেই থাকছি।

কাল থেকে ওরা মুড়ি চিবিয়ে আছে। আজ মুড়িও মিইয়ে গেছে। যতিলাল ভাতে ভাত তো চাপাবে, কিন্তু চাল!...

নকড়ি বলে—চালের হাঁড়িটা দেওয়াল-চাপা পড়ে গেছে রে।

হাসে অবিনাশ—তোদের বরাতের মতই পাথরচাপা। ওই মিয়োনো মুড়িই খা। আর কি জুটবে।

কিন্তু ওদের সাধ্য আর লড়াই-এর ক্ষমতা যেন ফুরিয়ে আসছে। ক'দিন এভাবে চলবে জানে না। নকড়ি বলে:

—তাই তো ভাবছি অবা। জল নামলে চাষ-আবাদ কি করে হবে? বীজধান নাই—খাবার নাই।

সমস্যাটা যে অনেক বড় তা অবিনাশও জানে। কোন পথই দেখতে পায়নি সে। চুপ করে ওই দিগন্তপ্রসারী বানে ডোবা অঞ্চলের দিকে চেয়ে থাকে। বাতাসে ওঠে জলস্রোতের অট্টহাসি, নিষ্ঠুর সেই শব্দ।

যতিলাল বলে ওঠে—আমাদের লিখনই এই রে। যাও দাসজীর কাছে, খত দিয়ে ট্যাকা কর্জ করে এনে না খেয়ে না-দেয়ে ধান ফলাও। পাকা ধানে উনি আসবেন সুদ—তস্য সুদ আর মূলধন উসুল করতে।

অবিনাশ ভাবছে কথাটা। মনে হয় তাদের ন্যায্য পাওনাটুকুকেও ওরা আড়াল করে রেখেছে, যাতে ওদের মাথাগুলো কোনদিনই সোজা না হতে পারে। ভাবনার কূল-তল নেই। পেটের খিদেটাও চাগিয়ে ওঠে।

নকড়ি ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ একটা শব্দ—কাদের টুকরো কথা শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তহীন স্তব্ধতা আর শূন্যতার মাঝে ওদের নৌকার দাঁড়ের শব্দ—দু'একটা কথা কেমন চমক আনে এখানে।

যতিলাল বলে,—নৌকায় কে আসে গ। প্রভাত মাস্টারকে দেখছি!

প্রভাতবাবু নৌকা থেকে নেমে এক হাঁটু কাদা, খড় পচার জঞ্জাল পার হয়ে উঠে এল। দেখছে সে মানুষগুলোকে। প্রকৃতির নির্মম আঘাতে এরা মুষড়ে পড়েছে। মানুষ আর প্রকৃতি সকলেই যেন এদের শত্রু। সমবেতভাবে তাদের আঘাত দিয়ে চলেছে, আর এই মানুষগুলোও মুখ বুজে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে বাঁচার জন্য লড়াই করছে। প্রভাতবাবু শুধোয়ঃ

—কেমন আছো অবিনাশ?

অবিনাশ প্রভাতবাবুর কথায় চাইল। ওর চোখে বেদনার্ত ক্লান্ত চাহনি। শক্ত বলিষ্ঠ দেহটা যেন নুইয়ে পড়েছে, ক'দিনে চোখের কোলে জমেছে কালির আস্তরণ। যতিলাল বলে—আর বেঁচে থাকা বাবু! সবই তো গেল। বৌ-বাচ্চাদের পাঠিয়েছি

স্কুলবাড়িতে। তবু থাকতে জায়গা পাবে, যা হোক দু'মুঠো খেতে পাবে।

অবিনাশ বলে ওঠে—কিন্তু কদিন? তারপর? চিরকাল কে খেতে দিবেক হে।

তারপরের প্রশ্নই ওদের সামনে আজ বড় হয়ে উঠেছে। প্রভাত-বাবুও তার পরের প্রশ্নটার কোন উত্তর দিতে পারেন না। বুড়ো নরহরি তখনও তামাক টেনে চলেছে। দা-কাটা তামাকের বেশ কিছুটা সে বাঁচিয়ে এনেছে। আর কিছুই খেতে জোটেনি। হুঁকোতে ওই তামাক টেনেই ঠায় রাত জেগে কাটিয়েছে আর খং খং শব্দে কেশেছে। গলার রগগুলো ফুলে ওঠে। যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

নরহরি কাশি চাপতে চাপতে বলে:

—জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ভগমান—

অবিনাশ গর্জে ওঠে—ওসব ভগমান-টগমান রাখো দিকি খুড়ো। ভগমান ওই গেণু দাস, নেতাই ঘোষ। ওরা ব্যাটা ভগমানকে কিনে নিয়েছে। তোমার আমার জন্য ভগমানের ভাবতে বয়ে গেছে। চোখে এখনও যেন আগুন জ্বলে। প্রভাতবাবু বলেন—সরকারী রিলিফ আসছে। বীজধানও দেবে তারা।

ওরা তেমন উৎসাহিত বোধ করে না। প্রভাতবাবু বলেন:

—দেখা যাক, ঠিকমত যাতে রিলিফ পায় লোকে। সেই ব্যবস্থাটা ভেবে চিড়ে-চাল-ডাল কিছু এনেছিলাম। ওগুলো নামিয়ে নাও।

যতিলাল-শিবু কামার ওসব নামিয়ে আনে। অবিনাশ গুম হয়ে বসে ছিল। প্রভাতের কথায় চাইল। প্রভাত বলে:

—তোমাদের বৌকেও দেখলাম ওখানে।

টিয়া জোর করেই গেছে ওখানে। কিন্তু আজ অবিনাশের মনে হয় টিয়া তার বাবার ওখানেই যেতে চেয়েছিল। অবিনাশই রাজী হয়নি। আজ মনে হয় টিয়া এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে, অনাহারের মধ্যে থাকতে পারতো না। ওখানে গিয়েছে বাধ্য হয়েই।

কিন্তু অবিনাশের মনে হয় টিয়াকে বাবার ওখানে সহরে পাঠানোই ছিল ভালো। সেখানে দেখেছে অন্য এক পরিবেশ। তার ভাই আর বোনদের স্বভাব চরিত্রের সম্বন্ধে, তাদের সহরের ভোগউছল জীবনের সম্বন্ধে বেশ একটা চাপা ঘৃণা রয়ে গেছে অবিনাশের মনে। ওই নোংরা পরিবেশে সে টিয়াকে পাঠাতে চায়নি। অবশ্য তার আপত্তির কারণটা খুলে বলতেও পারেনি সে টিয়াকে। টিয়া তাই ভুলই বুঝেছে তাকে।

আজ অবিনাশের মনে হয় তবু ক'দিনের জন্য টিয়াকে সেখানে পাঠাতে পারতো।

অবিনাশ শুধোয়—ভালো আছে তো সে ?

প্রভাতবাবু দেখেছে ওই হাজারো মানুষের অবস্থা। ক'দিনেই সারা স্কুলটা নোংরায় ভরে উঠেছে। গন্ধ ছাড়ছে। আর খাওয়ার ব্যবস্থাও তেমনি। এছাড়া করারও কিছু নেই। তবু প্রভাতবাবু বলে সান্ত্বনার সুরে—ভালোই আছে।

অবিনাশ কি ভাবছে। ওরা ফিরছে নশীপুরের দিকে। অবিনাশ বলেঃ

—একবার ঘুরে আসি ন'কড়ি। ওরা সব গেল। কেমন আছে খবর নিই আসি! কি রে যতিলাল ?

ওরাও খবর পেতে চায় ওদের। বাড়ির লোকজনদের ছেড়ে থাকতে অভ্যস্ত নয় ওরা। তাই অবিনাশকে যাবার কথা বলতে দেখে যতিলাল বলে—তাই যাও। আর দেখে-শুনে এসো সরকারী লোকজন কখন আসছে। তিন-চার দিনের পর জল নেমে গেলে বাঁধ মেরামত করতে হবেক। মাঠেও নামতে হবেক—সে সব বেত্তান্ত জেনে এসোগে!

অবিনাশও জানে সেটা। তাই একবার যাওয়া দরকার। অবিনাশ ওদের সঙ্গে গিয়ে নৌকায় উঠলো।

সারা মাঠ-এ জল—আর উঁচু ডাঙ্গার হাঁস নেমেছে সেখানে জমেছে কাদা—গাছগাছালিগুলো পচে হেজে গেছে। অবিনাশ দেখছে সেই সর্বনাশটাকে।

কলকাতা থেকে সদর-সহর হয়ে কেতুলাল লোকজনদের নিয়ে ফিরেছে। গেণু দাস জানতো—কেতুলাল এখন চালু হয়ে গেছে। তবে সাবধানী গেণু দাস কেতুকে ঠিক লয়ে বেশী বাড়তে দিতে চায় না। তাকে তার হাতেই রাখতে হবে।

কেতুলাল হৈ-চৈ করে খবরের কাগজের লোক-ফটোগ্রাফার-ডি এম সাহেবকেও টেনে এনেছে। ওদিকে কয়েকটা ট্রাকে করে মাল-পত্র এসেছে। টিন, তেরপল আর বস্তাবন্দী চাল, ডাল, চিড়ে চটের বোরা জড়ানো ভেলি গুড়ের তাল, টিন টিন কেরোসিন তেল, তুলোর কম্বল—গাঁটবন্দী কাপড়-জামাও এসেছে।

একটা নৌকা—তাই দিয়ে নদীর খেয়া পার হয়ে এসেছে ওরা। গেণু দাস গেষ্ট হাউসে ওদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায়। সুন্দর সাজানো বাংলো—বাগানে ফুলের সমারোহ, বিরাট বারান্দায় সান-মাইকার টেবিলে আসে দামী সুরভিত চা-বিস্কুট—এই সর্বনাশের মধ্যে দাসমশাই-এর বাড়ির ছানার সন্দেশও ঠিক হচ্ছে।

সাংবাদিক ভদ্রলোক অবাক হন—এতো সব কেন? শুধু চা হলেই যথেষ্ট!

ডি-এম সাহেবও বলেন—অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন গেণুবাবু। এসবের কোন দরকার নেই।

তিনি বিস্কুট একখানা তুলে নিয়ে চা খেয়েই বের হতে চান ওই সব গ্রামের দিকে। ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকও বলেন ঃ

—দিনের আলো থাকতে থাকতে যেতে হবে। কিছু 'কভার' করতে চাই।

নৌকাটা নেই। তখনও ফেরেনি প্রভাতবাবুদের নিয়ে। গেণুদাস খবরটা শুনে ধমকে ওঠে বদনকেই—তুমি ওদের যেতে দিলে কেন?

—প্রভাতবাবু রিলিফ নিয়ে গেল।

বদন ডাক্তার জবাব দেবার চেষ্টা করে।

গেণু দাস গর্জে ওঠে—ওগুলো কোথায় যাবে জানো? ওই মাস্টারকে চেনো না? ও যেন বাবার সম্পত্তি পেয়েছে।

প্রভাতবাবু ফিরেছে, এদিকেই আসছিল ডি-এম সাহেবের আসার কথা শুনে। কিন্তু গেণু দাসের ওই কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে সে।

গেণু দাসও ওকে দেখে ব'লে—এই যে, এদিকে সাহেবরা বেরোবেন—কলকাতার কাগজের লোকজন এসেছে। তুমি নৌকা নিয়ে কোথায় ছিলে ?

প্রভাত ওর দিকে চাইল। দেখছে লোকটাকে।

এর মধ্যে ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে ওকে দেখেছে। গেণু দাসও লোঙরখানায় গিয়ে ওই হাজার মানুষের খাওয়ানোর দৃশ্যের সঙ্গে নিজের ছবিটাও তুলিয়ে নিয়েছে। আজ ওদের সামনে গেণু দাস অনেক মহান ব্যক্তি। তার নিঃস্বার্থ দানে এই এলাকার বহু মানুষ বেঁচে গেছে। এটা সে বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই মেজাজ নিয়েই প্রভাতকেই ধমকে ওঠে।

অবিনাশও এসে পড়েছে। সেও শুনেছে কথাগুলো।

গেণু দাস ওদের চুপ করে থাকতে দেখে বুঝেছে, তার কথাটা ওরা ভালোভাবে নেয়নি। আর ব্যস্ততার মধ্যে গেণু দাস অধৈর্য হয়ে একটু ভুলই বলেছে। তাই এবার বলে সে ঃ

—ওঁরা তাড়া দিচ্ছেন। চলো—দেখি গে।

অবিনাশকে দেখে আরও অনেকে এগিয়ে আসে। কয়েকখানা গ্রামের মানুষজন ভিড় করেছে। ডি-এম সাহেবও অবিনাশের কথায় চাইলেন। অবিনাশ বলে ঃ

—বানের জল কমলে আগে ভাঙ্গা বাঁধ বাঁধতে হবে স্যার, না হলে আবার বান হবে, আবার ডুববো আমরা। আর বীজধান—চাষের খর্চা—এসবের ব্যবস্থা করুন। দুদিন রিলিফের খিচুড়ি খেয়ে টিকতে পারা যায়, বাঁচা যায় না হুঁজুর।

গেণু দাস-এর মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। মনে মনে সে রেগে উঠেছে প্রভাতের উপরই। অবশ্য সে কিছু বলেনি, কিন্তু হুজুরদের আসার খবর পেয়েই সে চলে গেছল ওই লোকগুলোকে খবর দিতে। যাতে ওরা এসে হুজুরদের সামনে এই সব কথা জানাতে পারে।

তরুণ ডি-এম সাহেবও মন দিয়ে শুনছেন ওদের কথা।

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ওদের কথাগুলো শুনছেন, কি লিখে নিচ্ছেন ওদের নাম, বাড়ি—কতো জমি ডুবেছে। কি কি ফসল গেছে এই সব। ফটোও তুলে নেন ওদের। ওই ডুবো জমি-গুলোর।

অবিনাশদের এড়াবার জন্য গেণু দাস বলার চেষ্টা করে ডি-এম সাহেবকে—নৌকা তৈরী হুজুর!

কেতুলাল ওদিকে ব্যস্ত।

ডি-এম সাহেব যেন গেণু দাসকে এখন চিনতেই পারেন না। ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—ওদের বলতে দিন।

গেণু দাস চুপ করে যায়, অপমানিত বোধ করে সে। আজ তার এত কৌশল যেন ব্যর্থ করে দিতে চায় ওই প্রভাতবাবুর দলবল। গেণু দাস সরে এসেছে। হঠাৎ কেতুলালকে দেখে বলে—কোথায় ছিলে? গেণু দাস কেতুলালকে দেখে এগিয়ে আসে।

কেতুলালও ব্যাপারটা বুঝে সামাল দেয়। সে নিজেই সাহেবকে বলে:

—চলুন স্যার, ওকেও সঙ্গে নিন। চলো অবিনাশ—ওই দিকেই যাবো। তোমাদের গ্রামও দেখবো।

ওদের নিয়ে নৌকায় উঠে বের হয়ে গেল ওরা।

গেণু দাসকে বলে কেতুলাল—ততক্ষণে দুটো নৌকা লাগিয়ে ওপারের ট্রাকগুলোর মালপত্র খালাস করো গেণুদা।

ডি-এম সাহেবও বলেন,—হ্যাঁ, ওদের ছেড়ে দিতে হবে। নেক্স্ট ট্রিপ আনবে। আর মালপত্রগুলো একটা ভালো জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করুন। সেইটাই স্টোর রুম হবে। এসে ওই সব চেক করবো।

গেণু দাস জানে কিভাবে কি করতে হয়। ও বলে:

—ওসব হয়ে যাবে স্যার।

ওরা চলে গেল নৌকা নিয়ে।

গেণু দাস বদনকে বলে—ওগুলো খালি করিয়ে আমার গুদামে তোলো গে। হুজুরদের দেখাতে হবে। হিসেবের মাল সব যেন ঠিক-ঠাক থাকে।

বদন দত্ত ঘাড় নাড়ে—ওসব ভাববেন না গেণুবাবু।

প্রভাত দাঁড়িয়ে দেখল মাত্র। গেণু দাস তার চর-অনুচরদের নিয়ে এবার কর্মযজ্ঞে নেমেছে। তবু যাবার সময় গেণু দাস প্রভাতের দিকে চাইল। গেণু দাস সন্ধানী চতুর ব্যক্তি। ও দেখেছে প্রভাতের চোখে একটা জ্বালা ফুটে রয়েছে।

গেণু দাস ওদের বিশ্বাস করে না। একটু আগেই ওরা হাজারো মানুষ দিয়ে একটা আন্দোলন-ই খাড়া করে দিতো। অবিনাশও তাই চেয়েছিল বোধহয়। কিন্তু এবার সেও সাবধান হয়েছে। তবু প্রভাতের সম্বন্ধে তার ভয় একটা রয়ে গেছে।

ওদিকে কলরব উঠছে। খাবার-দাবারের তেমন যোগাড় আজ নেই। গেণু দাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই সেও আজ থেকেই এবার সুদসমেত উশুল করার কথাই ভাবছে। ওদিকে কলরব ওঠে।

—সাহেব কোথায়? খেতে পাইনি আমরা, তা দেখবেক নাই গো! প্রভাতবাবু ওই দিকে এগিয়ে গেল। অরুণ, গণেশ মিত্তির আর ক'জনকে বলে।

—রিলিফের চাল এসে গেছে, ওদের খাবার দেওয়া হবে বলে দাও। ততক্ষণ কিছু চিড়ে-গুড়ই দিতে হবে।

অরুণ বলে—দাসজী তো ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে গেছে।

কে গর্জে ওঠে—নিয়ে এসো চাবি।

একটা গোলমাল উঠছে। প্রভাতবাবু এগিয়ে গিয়ে ওদের থামিয়ে নিজেই গেল চিড়ে-গুড়ের কিছু বস্তা আনাতে।

টিয়া ওই ইস্কুলবাড়ির ভিড় আর নোংরা পরিবেশ থেকে সরে এসে এখানে ঠাঁই পেয়ে যেন বেঁচেছে। একটা ছোট ঘরই ব্যবস্থা করেছে ওরা ওর জন্য। বেশ নিরিবিলি। ওদিকে কয়েকজন

কাজের লোক থাকে। আর তারাও টিয়াকে যেন একটু সমীহ করে চলে। টিয়া এখানে এসে স্নান করেছে, শাড়ি বদলাতে গিয়ে দেখে একজোড়া নতুন শাড়িও আছে তার জন্য। কিছু টুকিটাকি জিনিষও আছে। আর বুড়ি মেয়েটি তাকে খাবারও দিয়ে যায়। যতীনের মা বলে ঃ

—তা, বাবুর হুকুম বাছা, নাও খেয়ে নাও। ওই ক্যাঙ্গালী ভোজনের খাওয়া কি খেতে পারা যায়? ছ্যা-ছ্যা যে হুল্লোড় কাড়া-কাড়ি চলেছে। বৌ-ঝিদের মান-ইজ্জতও থাকবে না।

ডাল-ভাত, একটা তরকারী, একটু করে মাছও রয়েছে। টিয়া কেমন বিব্রত বোধ করে। সে শুধোয় ঃ

—এসব কেন?

যতীনের মা বলে—বড়বাবুর হুকুম বাছা। তা বাবু আমাদের দেবতুল্যি মানুষ। দয়ার শরীর। নাও বাছা খেয়ে নাও। যা ধকল গেছে ক'দিন।

টিয়ার এসব খেতে যেন ঠিক ভালো লাগে না। ওদিকে দেখেছে করুণ হাহাকার। তার মাঝে তাকে এই স্বাতন্ত্র্য দিতে নিজেও মনে মনে বিস্মিত হয়েছে মেয়েটা। অবিনাশের কথা মনে পড়ে। ওই বন্যার মাঝে পড়ে আছে লোকটা, খেতে পাচ্ছে কি না কে জানে। ক'দিন ওকে ওই অসহায় অবস্থায় রেখে চলে আসার পর টিয়ার নিজেরই খারাপ লাগে।

অনেক চেষ্টা করেছে টিয়া, তবু সে সেই ঘরে মন বসাতে পারে নি। এই দারিদ্র্যকে মেনে নিতে পারে নি। বার বার মনে হয়েছে অবিনাশ এই কষ্টের মধ্যেই থাকতে চায়, আর তাকেও কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করাতে চায়। অথচ টিয়া জানে বাইরে গেলে তারা এর থেকে ভালোভাবেই বাঁচবে। সেখানে পয়সা দেবার মত অনেক লোকই আছে। কথাটা অবিনাশকেও সে বোঝাতে পারেনি। আজ তবু ক'দিন ওই বিপদের মধ্যে লোকটাকে ফেলে রেখে এসে টিয়া তার জন্য দুঃখ বোধ করে। অবিনাশকে মনে পড়ে অকারণেই।

হঠাৎ জানলা দিয়ে ওই কলরব-কোলাহল শুনে চাইল, কারা এসেছেন কলকাতা থেকে।

যতীনের মা বলে ঃ

—ড্যাম সাহেবও এয়েছে শোনলাম। কেতুবাবু আর আমাদের বড়বাবু, এখানের লোকের জন্যে কতো ভাবে বাছা, সাতমুলুক থেকে কুড়িয়ে রাজ্যির দ্রব্য এনেছে বানে ভাসা লোকগুলোর জন্য। তা ওই মুখপোড়ারা এমনি মানে? ওই পরভাতবাবু গ? ম্যাষ্টার।... আর অনামুখো কিছু লোক জুটে দিনরাত ক্যাচালি করছে। বলে না নিদ্ধনো পুরুষের কুলোপারা ফণা।

টিয়া চেনে প্রভাতবাবুকে। তাই শুধোয়—তার কি হল? তিনি কি করলেন?

যতীনের মা বলে—ত্যানার কথাই বলছি বাছা। বাবুর ইস্কুলে চাকরি করছিস, বড়বাবুরই খাচ্ছিস—পরছিস। তাই বলে বড়বাবুর পিছনে লোক খেপাবি? ধম্মো আর রইল কোথায়?

যতীনের মা কথাগুলো বলে চলেছে।

টিয়াও জানে সেটা।

কিন্তু, টিয়ার মনে হয় যতীনের মা জানে না ওই বড়বাবুদের আসল পরিচয়, আর না হয় জেনে-শুনেও চুপ করে থাকে শুধু পোড়া পেটের দায়ে। যতীনও বড়বাবুর এখানেই কাজ কাম করে, আর যতীনের গুণের খবর টিয়াও জানে। রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে যতীন এ-গ্রাম সে-গ্রাম হানা দিয়ে অসহায় গৃহস্থের সর্বস্ব লুঠ করেছে। রাতের বেলায় বাঁকুড়া রোডের উপর ট্রাক থামিয়েও চুরি করেছে দলবল নিয়ে। সেবার ভোটের সময় যতীনের দলবল তাদের গ্রামে, আশপাশের গ্রামে গিয়ে লোকদের শাসিয়েছে—ভোট ওই কেতুলালকে দিতে হবে। না দিলে—

পরের ইতিহাসটা খুবই স্পষ্ট।

অবিনাশ, নকড়ি, যতিলালদের সেও চেনে। আর টিয়াও চেনে যতীনকে। ওই যতীন এখন গেণু দাসের পোষা নোকর, কুকুরও

বলা যায়। তাদের মুখ থেকে এমনি কথা তো বের হবেই।

কি কৌতূহল নিয়ে টিয়াও ওই বাড়ির সামনে বাগানের ধারে বের হয়ে এসেছে। কেতুলাল, ডি-এম সাহেব গেণু দাসদের দেখছে। হঠাৎ নজরে পড়ে টিয়ার—অবিনাশ এসেছে এখানে, প্রভাতবাবুর সঙ্গে অবিনাশ, আরও কয়েকজন লোকও এসেছে।

কি আশা নিয়ে টিয়া এগিয়ে যায়, অবিনাশ তাকে দেখেছে বোধহয়। মনে হয় অবিনাশ এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াবে। খবর নেবে কেমন আছে এখানে, টিয়ারও বিশ্রী লাগে এখানে। এখানে তাকে অনেকেই এড়িয়ে চলে, কদিনেই টিয়া দেখেছে ওর যেন জাত বদলে গেছে এই বাড়িতে উঠে আসার পর থেকেই। ওরাও এড়িয়ে চলে। তার গ্রামের বৌরা।

সেদিন গিরিবালা, নকড়ির বৌ ওরাও এসেছিল তার এখানে। গিরিবালা ছিমছাম নিরিবিলি ঘরখানা দেখে এদিক-ওদিক চেয়ে বলে :

—তা বাছা বেশ ভালোই রইছিস লাগছে।

নকড়ির বৌ বলে—তা থাকবে বৈকি। শোনলাম বড়বাবু নিজে এখানে পাঠিয়েছে টিয়াকে। তা বাপু নজরে পড়ার মত রূপ-গুণ থাকলে চোখে তো পড়বেই। দিনও বদলাতে কতোক্ষণ।

গিরিবালা আর ওই মেয়েগুলোর মধ্যে চোখে চোখে কি যেন ইঙ্গিত হয়ে যায়। কিন্তু জবাব দিল না টিয়া। ওর মনের অতলে একটা চাপা রাগই জেগে ওঠে। ওরা তাকে হিংসা করেছে এতকাল গ্রামেও। তার শাড়ি-জামা, সামান্য বেশবাস, প্রভাতবাবুর সঙ্গে হেসে কথা বলা নিয়েও পুকুর ঘাটে, পথে, দুপুরের বৈঠকেও অনেক কিছু আলোচনা করেছে। এসব খবর জানে টিয়া। তার মনটাকে ওরাও বিষিয়ে তুলেছে। তার রূপ যৌবন আছে—একটু ছিমছাম হয়ে থাকতে চায়, এসব কি টিয়ার দোষ?

টিয়া এসব মানতে চায় না। তবু ওদের নানা বিশ্রী ইঙ্গিত-গুলোর খবর সে জানে।

আজ এই বিপদের মধ্যে এখানে আশ্রয় নিতে এসেও ওরা সেই নোংরা স্বভাবটাকে ভোলেনি। টিয়া বেশ বুঝেছে ওরা এসেছে তার এখানে—তার সম্বন্ধে এমনি সরস তীক্ষ্ণ কিছু মন্তব্য করতে।

গিরিবালা গলা নামিয়ে শুধায়—বানের জল নামছে, বাড়ি যাবি তো?

টিয়া গিরিবালার কথায় অবাক হয়ে চাইল। ওর কথার সুরে কি যেন চাপা একটা ইঙ্গিতই রয়েছে।

টিয়া অবাক হয়ে জানায়—কেন, বাড়িতেই যাবো বৈকি!

—অ। গিরিবালা ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বলে—ভাবলাম বুঝি সহরে ভাইদের ওখানেই যাবি। তা বাছা নিজের ঘরের তুল্যি ঠাঁই আছে? বলে না—আপন কুঁড়েঘর স্বগ্যো তুল্যি।

টিয়া চুপ করে থাকে।

গিরিবালাদের বার কয়েক দেখে গেছে যতীনের মা বুড়ি। গিরিবালাও সন্ধানী মহিলা। ওর চোখের চাহনিটা ভালো লাগেনি গিরিবালার। তাই চাপা স্বরে শুধোয় গিরিবালা:

—ওই বুড়িটা কে-লা?

টিয়া জানায়—এখানের সব কিছু দেখাশোনা করে যতীনের মা।

গিরিবালা বলে ওঠে—ওরে বাবা। ডাকাতের মা চৌকিদার। তা বাছা এখানের ব্যাপার-স্যাপার দেখছি আলাদা। তা খেতে-টেতে ভালোই দেয় শুনেছি ইখানে। জামা-শাড়িও দিইছে। আমাদের ওখানে ওই লপ্‌সিই সম্বল। এসব ছেড়ে ভিটেতে ফিরতে পারলে বাঁচি। চল গো বৌ।

ওরা চলে যায়। টিয়া চুপ করে ভাবছে ওদের কথাগুলো। ওরা যেন একটা ব্যঙ্গের জ্বালাই ছিটিয়ে দিয়ে গেছে তার সারা মনে। মনে হয় টিয়া যেন ওদের থেকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীর মানুষ। যাকে ওরা তীক্ষ্ণভাবে ব্যঙ্গ করে, ঘৃণা করে।

টিয়া চুপ করে সব কিছু সহ্য করে গেছে।

আজ ওই কর্তাদের সরেজমিনে এখানে এসে সব খোঁজ-খবর

নিতে দেখেছে টিয়া। কেতুলাল-গেণুবাবুরা তবু এখানের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে এটাও দেখেছে টিয়া।

আজ অবিনাশকে দেখে কি চাপা উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এসেছে টিয়া! দূর থেকে এত লোকের মধ্যে চোখে পড়ে অবিনাশকে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারায় ক'দিনেই একটা ভাঙ্গনের ছাপ পড়েছে। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। চোখ দুটোয় তবু একটা দীপ্তি ফুটে রয়েছে।

অবিনাশ ওই গেণুবাবু, ডি-এম সাহেবদের কি বলে চলেছে। ওরা শুনছে অবিনাশের কথাগুলো। টিয়া দূর থেকে দেখছে ওই তেজী লোকটাকে।

ক্যামেরায় একঝলক আলো ফুটে ওঠে। কারা ছবি তুলছে।

টিয়ার মনে হয় অবিনাশও তাকে দেখেছে। এবার ভিড় ঠেলে অবিনাশ এগিয়ে আসবে তার দিকে। তার সঙ্গে কথা বলবে, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলবে।

টিয়াও শত অভাবকেই মেনে নিয়ে আবার ওই তেজী লোকটার সঙ্গে ফিরে যাবে নিজের ভিটেতে। আবার ভাঙ্গা ঘরটাকে সারিয়ে নতুন ঘর বাঁধবে।

এবার টিয়া অনেক কষ্ট-অভাব আর দুঃখ-বিপর্যয়কে দেখেছে, তার মধ্য দিয়ে চিনেছে তার ঠাঁইটুকুকে—আপনজনকে। এইখানেই বাঁচার চেষ্টা করবে সে সব সহ্য করে।

তারই প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি অসহায় মেয়ে, ওই টিয়া। কলরব-কোলাহলের থেকে দূরে কে তার প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হতাশ হয় টিয়া।

তার দিকে চাইবার সময় অবিনাশের নেই। তার চোখই বোধ-হয় এত লোকের মধ্য থেকে টিয়ার দিকে পড়ে নি। হয়তো দেখে থাকলেও টিয়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই অবিনাশের।

সে চলে গেল ওই সাহেবদের সঙ্গে নৌকার দিকে।

টিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওরা নৌকা দুটোয় উঠে চলে

গেল বানে ডোবা মাঠ-প্রান্তরের উপর দিয়ে ওই ভাসমান গ্রাম-এর ধ্বংসাবশেষের দিকে।

টিয়ার দু-চোখ জলে ভরে আসে।

অবিনাশের অবজ্ঞাটা তার সারা মনে একটা হাহাকার এনেছে। ঝড় তুলেছে। লোকজনের ভিড় কমে গেছে ওদের চলে যাবার পর। টিয়া একাই একটা সোঁদাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সব সবুজ পাতার প্রান্তে গাঢ় হলুদ ফুলের মঞ্জরীগুলো ঝরে পড়ছে। এসেছে ডালে ডালে নিঃস্ব বিবর্ণতা। এ-যেন টিয়ার জীবনের মতই, ফুল ফোটার পালা ফুরিয়ে গেছে তার জীবন থেকেও।

হঠাৎ গিরিবালার ডাকে চাইল টিয়া।

বুড়িও প্রথম থেকেই দেখেছে টিয়াকে। মেয়েটা বের হয়ে এসেছিল অবিনাশকে দেখে। কিন্তু দেখেছে গিরিবালা, অবিনাশ ওর দিকে চাইবার সময়ও পায় নি, বোধহয় দরকারও বোধ করে নি। টিয়া দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হা-পিত্যেস করে।

গিরিবালা-যতিলালের বোন-নকড়ির বৌও দেখেছে ব্যাপারটা, তারা মনে মনে খুশীই হয়েছে।

এবার ওই ভিড় কমে যেতে অবিনাশ চলে যাবার পর এসে হাজির হয়েছে গিরিবালা। ও শুধোয়ঃ

—কি বললো র‍্যা অবা? নিতে এসেছিল বুঝি তোকে?

টিয়া চাইল গিরিবালার দিকে। ওর চোখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসিটা দেখেছে টিয়া। তাই বলে সেঃ

—কাজে এসেছিল, সময় পায়নি, কর্তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ফিরে আসবে একটু পরেই। কাজের মানুষ কিনা, ফিরে এলে কথা হবে।

কথাটা জানিয়ে টিয়া বেশ মাথা উঁচু করে এ-বাড়ির দিকে ফিরে এল। গিরিবালা হঠাৎ মুখের মত জবাব পেয়ে বেশ চটে উঠেছে মনে মনে। গিরিবালা গ্রামের মেয়েদের মুখপাত্র হয়েই টিয়াকে কথাটা শোনাতে এসেছিল। কিন্তু শক্ত জবাব পেয়ে বেশ চটে উঠেছে গিরিবালা। বলে ওঠেঃ

বরের চাকরি প্যাদাগিরি

তায় রেখেছে মোচ্

সেই গরবে মাগের গরব

ঘরে দেয় না ছোঁছ!

কাজের মানুষ কিনা, রাজকাজে এয়েছিল, কথা বলবার সময় পায় নি। মরণ!

এবার গিরিবালা বেশ গলা তুলেই বলে—এখানে যে রাসলীলা করছিস সেটা কি শোনে নি লা? তাই কথা বলেনি ধিক্কারে। তোর খবর কে না জানে।

কথাটা শুনেছে টিয়া।

থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় ঘুরে গিয়ে জবাবটা এবার দিয়ে আসবে। কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল টিয়া। কথাটা সে ভাবেনি। হঠাৎ মনে হয় ওরা সব পারে। হয়তো ওদেরই কেউ অবিনাশের কানে নানা মিথ্যা কথা অতিরঞ্জিত করে বলেছে, আর তাদের কথাগুলো শুনে শুনে ওই অবিনাশও তাকে এড়িয়ে গেছে আজ ইচ্ছা করেই, ঘৃণাভরে।

টিয়া অবাক হয়। এ সম্বন্ধে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনও বোধ করে নি অবিনাশ। এক তরফা ওদের কথা শুনেই তার সম্বন্ধে এতবড় একটা ভুল করবে, এটা ভাবতে পারে না টিয়া।

টিয়া চুপ করে এসে ঘরে ঢুকলো।

ব্যাপারটা দেখেছে যতীনের মা। ওর নজর সব দিকেই। বুড়ি দেখছে ক'দিন থেকেই ব্যাপারটা। ওই মেয়েগুলোর কথাবার্তাও শুনেছে, এখানেও এসেছে ওরা। সব যেন সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে-শুনে গেছে।

অবশ্য যতীনের মা জানে গেণুবাবুদের। কিন্তু এত টাকা পয়সা যাদের—তাদের এসব অভ্যাসগুলোকে যতীনের মা মেনে নিয়েছে সহজ বলেই। তাই টিয়াকেও সে দোষ দিতে পারে না।

যতীনের মা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার গিরিবালাকে দেখে বলে ওঠে :

—বেচারা মেয়েটাকে কি বলেছিলে গা ?

গিরিবালা একটু থমকে দাঁড়ালো। যতীনের মায়ের পদমর্যাদা সে দেখেছে। আর এদের আশ্রয়েই আছে। ক'দিন তবু থাকতে খেতে পাচ্ছে, আবার নাকি চাল-শাড়ি-কম্বল এসবও মিলবে। তাই ওকে চটাতে সাহস করে না।

যতিলালের কাঠবিড়ালীর মত বউটা ব'লে :

—গাঁয়ের বৌ, পাড়াতেই ঘর, তাই কথা বলছিলাম।

যতীনের মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওদের।

গিরিবালাও জবাব দেবার একটা পথ পেয়ে ব'লে :

—এই খোঁজ-খপর নিচ্ছিলাম বাছা। কেমন আছে-টাছে।

যতীনের মা বেশ চড়া গলায় বলে :

—দরদে ফেটে পড়ছো কিনা, তাই খপরের জন্যে হেদিয়ে উঠেছো।

যতীনের মা কথাগুলো শুনিয়ে এই বাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

গিরিবালা সদলবলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কিছু না বললেও ওরা যে জ্বলে-পুড়ে মরছে, এটা বোঝা যায়। অথচ বেশ বুঝেছে বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওই যতীনের মাও ছেড়ে কথা কইবে না। তাই যতীনের মা চলে যেতে গিরিবালা গজগজ করে :

—বুড়িমাগী যেন দারোগা! মেজাজ ছাখ্ না!

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়, খাবার আয়োজন হয়ে গেছে। বন্দীলোকগুলোর এখন করার কিছুই নেই। পাতা নিয়ে বসে কলরব সুরু করেছে। গিরিবালা হাঁক দেয়—বসে পড় লা তোরা। কই গ বাবু খিচুড়ি ছান কেন্নে ?

প্রভাতবাবু দেখেছে চারদিকের অবস্থা। বানের জল নেমে আসছে। এই এলাকা ক'দিন জলে ডুবে একাকার হয়েছিল। এবার বের হচ্ছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণটা।

সবুজ দিগন্তের বুকে নদীর মত্ত তাণ্ডব বয়ে গেছে ক'দিনেই। কোথাও সবুজ ক্ষেতের বুকে গড়ে উঠেছে নদীর মত গভীর খাদ, বানের তোড় বয়ে গিয়ে নদীই হয়ে উঠেছে ক'দিন, আর চারদিকে নদীর রাশি রাশি বালি ধানক্ষেতকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। গ্রামের পুকুরগুলোর কালো টলটলে জল আর নেই। পাড়ের সবুজ গাছ-গাছালি—কলা পেঁপের গাছগুলো গলে পচে গেছে, পুকুরের জল ঘোলা বেনো জলে ভরে রয়েছে। আর কুয়ো, টিউবওয়েল দু'চারটে যা ছিল কাদা-নোংরায় নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়, আর সাজানো ঘর বাড়িগুলো ধসে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। এ যেন ধ্বংসপুরীর রাজ্য।

বর্ষার সুরু, এবার যেন আকাশ ছেয়ে মেঘ জমেছে নতুন করে ধ্বংসের আভাস নিয়ে। ক'দিন ধরে ওরা এই স্কুলেই পড়ে আছে। তাই যে যার বাড়ি ফেরার কথা এবার ভাবছে। ওদের মনে একটা চাপা অসন্তোষ জাগে। কে বলে :

—কতোদিন পড়ে থাকবো ইখানে? ঘর বাড়ির ব্যবস্থা করে দিবে বললেক, তার কি হলো?

দে গাঁয়ের লোকজন এবার ভাবনায় পড়েছে। নদীর হানা মুখ তাদের গ্রামের সামনেই। তখনও বাঁধ মেরামতের কাজ সুরু হয়নি। আবার বন্যা এলেই নদী থেকে জল বেরুবে; বাকি জমি, গ্রাম-বসত ডুবিয়ে দেবে। বালির স্তূপ বয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের জমিকে পাহাড় করে দিয়েছে, আরও দেবে। তারা এবার মুখর হয়ে ওঠে :

—ভিখেরীর মত ইখানে পড়ে থাকবো না। বাঁধ বেঁধে দিতে হবে। নদীমুখ বাঁধতেই হবেক।

…প্রভাতবাবু, অরুণ সেন, অবিনাশ এরাও এবার গ্রামে গ্রামে বাকী লোকদের নিয়ে মিটিং করেছে, সদরের কিছু লোকও এসেছেন। তাঁরাও দেখেছেন সব কিছু। ওঁরাও ভাবনায় পড়েন।

—এভাবে চললে কোন সুরাহা হবে না। কেতুবাবুদের দরকার হয় বলতে হবে।

অবিনাশ চুপ করে কথাটা ভাবছে। কয়েক দিনে তার দেহ-মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। ওই রিলিফের বাবুদের অনেক কথাই শুনেছে। কিন্তু যা ঘটতে দেখেছে সেটা মোটেই সুবিধার নয়। নিজেও সদরে দৌড়াদৌড়ি করেছে, নকড়ি, গুপীনাথ-যতিলালদের নিয়ে গেছে।

কিন্তু কর্তারা বলেন—সব ব্যবস্থাই তো কেতুলালবাবু, গেণুবাবুরা করেছেন।

অবিনাশ বলে ওঠে—ওদের হাতেই তাহলে আমাদের জান-মালের জিম্মাদারীর ভার তুলে দিয়েছেন আমাদের মতামত না নিয়েই?

ভদ্রলোক চাইলেন ওর দিকে। তিনি নিজে দেখে গেছেন এখানের ক্যাম্পের ব্যবস্থা। তাই বলেন—ওদিকের বহু লোকজন মেয়েদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

অবিনাশ একটু কঠিন স্বরে বলে—আমরা ওই ভিক্ষে চাই না স্যার। বাঁধটা বাঁধিয়ে দেন, আর একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই, কিছু বীজধান, গরু-বাছুরের জন্য খড়—কিছু খোরাকী দিন।

ওঁরা বলেন—দরখাস্ত রেখে যান। আমরা দেখছি।

…ক'দিন ঝড়ের মত কেটে গেছে অবিনাশের। দেখেছে ফিরে এসে তেমন কোন সুরাহাই হয় নি। ওই স্কুলবাড়িতে অসহায় বুভুক্ষু মানুষের ভিড় কিছু বেড়েছে মাত্র।

অবিনাশ বসন্তকে দেখে চাইল।

দু'দিন সদরে থেকে ফিরছে অবিনাশ। কিন্তু বসন্তকে পাতা নিয়ে ওইখানে বসে খিচুড়ি খেতে দেখবে ভাবেনি।

—তুই! বসন্ত!

প্রথম দিকে এখানে আসেনি বসন্ত। প্রতিবাদই করেছিল—ওদের ভিক্ষে নোব না হে!

বসন্তও কৃষক সমিতির একজন তেজী কর্মী। কিন্তু ক'দিনেই

লোকটার দশাসই শরীর ধনুকের মত বেঁকে গেছে। চোখের কোনে জমেছে কালির দাগ। একা নয়, বসন্ত এসেছে আধমরা বৌ আর শীর্ণ মেয়েটাকে নিয়ে। ওরা গোগ্রাসে গিলে চলেছে ওই লপ্‌সি।

বসন্ত যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে। তাই আমতা-আমতা করে—ওদের নিয়ে আর উপোস দিতে লারলুম অবা। দু'দিন পড়ে থেকে শেষমেষ—

বসন্ত কথাটা শেষ করতে পারে না। কি রুদ্ধ অপমানে ওর গলা যেন বুঁজে আসে।

পাশে বসেছিল নিতাই। একমনে খিচুড়ি খেয়ে চলেছে। নিতাই অবশ্য এখানেই থাকে। গেণুবাবুর সরকার মশাই-এর বাহন, খামার বাড়ির গরু-বাছুরের দেখাশোনা করে আর সন্ধ্যার পর থেকেই নিতাই-এর চেহারাটা বদলে যায়।

অনেকে বলে—নিতাই নাকি চোরা ভাটির মদ বানায়, আর সেই মদ বোতল বন্দী করে বাইরেও চালান যায়, খামারের বিরাট সীমানায় কেউ যায় না। মন্দ লোকে বলে—সরকার মশাই-এর নাকি ওটা নিজস্ব ব্যবসা, নিতাই ওই কাজগুলো দেখাশোনা করে। বেশ দাপটের সঙ্গেই এখানে আছে নিতাই।

নিতাই অবিনাশকে চেনে। এর আগে সেবারের নগাঁয়ের মেলায় যতীনের সঙ্গে ওদের গোলমাল বাধে। যতীন মেলাতে তিন তাসের আসর বসিয়েছে। কাজটা বেআইনী। কিন্তু ওরা জানে গেণুবাবুর লোক তারা। আর কেতুবাবুর তো যতীন-নিতাইকে না হলে চলে না। কেতুবাবুর ইলেকশনের সময় দু-চারটে জায়গাতে ভোটারদের ঠেকাতে হয়, যাতে ভোট দিতে তারা না পারে। আর যতীন-নিতাই-এর দলকেই সেই কাজটা করতে হয়।

তাই যতীন জানে তার জন্য আইনের বাঁধনটা আলগা হয়েই আছে। থানার বাবুরাও এখানে আসেন। তাদের পরিচর্যা গ্রহণ করেন, আর নিতাই-এর হাতযশের খবরও তাঁরা জানেন।

সব মিলিয়ে ওদের প্রতিষ্ঠা এখানে কায়েমই রয়েছে। শুধু অবিনাশ-নকড়ি যতিলাল আরও কিছু লোক তাদের দেখতে পারে না। প্রভাত মাষ্টার, অরুণ ডাক্তার ওদেরই দলে। যতীনকে সেবার ওরাই মেলা থেকে তুলে দিয়েছিল।

নিতাইও এসে হামলে পড়ে যতীনের জন্যে। নিতাই গর্জায়ঃ

—কেন তাস খেলবে নাই উ?

অবিনাশ বলে ওঠে—জুয়োখেলা বন্ধ করতেই হবে। সোজা যাবে তো যাও, না হলে—

ওর বাকী কথাটা ওরা অনুমান করতে পারে। ওরা মারধোরই করবে। তবু নিতাই গর্জায়—তোমাদের রাজ্যি নাকি হে?

নকড়ি সেবার হেঁকে ওঠে—তোর বাবা গেণু দাসের রাজ্যি এটা লয়! চোপা করবি তো নদীর চরে পুঁতে দোব ছাপ্।

ওই বসন্তও সেদিন ওদের দলেই ছিল। সামনে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে আজ।

···অবিনাশদের আজ দেখেছে নিতাই। সেই তেজ দাপট্ কোন্‌দিকে উবে গেছে। ওদের চোখের জ্বালাটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। বসন্তকে এবারও মুখ নিচু করে এখানে এসে হাজির হতে হয়েছে। যতীনও বলে—অনেক মামুরই এবার নাকখত দিতে হবে এখানে হে।

আজ নিতাই সেই অবিনাশকে এখানে এসে ওইভাবে বসন্তকে বলতে দেখে সেও বেশ দাপটের সঙ্গে বলেঃ

—কে কি করবে না করবে তুমি বলবার কে হে? ও যদি ইখানে আসে তুমি কথা বলবে কেনে? তুমি কি ওর মাগছেলাকে খেতে দিবা?

অবিনাশ নিতাই-এর মুখে জবাবটা পেয়ে ওর দিকে চাইল।

বসন্তও চুপ করে গেছে। চাপা রাগে অবিনাশের সারা মন জ্বলে ওঠে। একটা ব্যবস্থা হবে, কিন্তু বসন্ত যে তাদের না জানিয়ে

এখানে এসে নিতাই-যতীনের দলের একজন হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

অবিনাশ জবাবটা দিতে পারতো নিতাইকে, কিন্তু চেপে গিয়ে বলে—জবাব দে বসন্ত! কইরে জবাব দে!

নিতাই-এর চড়াগলায় দু-চারজন লোকও জুটে গেছে। যতীন ভাঁড়ার ঘরে ছিল। মালপত্রের দেখাশোনাও তাকে করতে হয়। সে এগিয়ে এসে অবিনাশকে ওই কথা বলতে দেখে জানায়—উকি জবাব দেবে? নিজেও তো ডব্‌কা বৌটাকে পাঠিয়েছো হে? আর সে তো ইখানের হাটের মধ্যে না থেকে উদিকে সেজেগুজে পরীটি হয়ে আছে। বলি তুমার মেয়েছেলের বেলায় দোষ নাই—দোষ উদের বেলায়? এ্যাঁ!

অবিনাশের রক্ত গরম হয়ে ওঠে. তার উত্তেজিত শিরাতন্ত্রীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়। অবিনাশ গর্জে ওঠে:

—যতীন!

অবিনাশ অন্য সময় হলে যতীনের শীর্ণ দেহটাকে সে একঝটকায় ছিটকে ফেলে দিতো, এর আগে নগাঁয়ের মেলাতে দিয়েছেও। আজ তবু সামলে নিয়েছে অবিনাশ। গর্জে ওঠে মাত্র। যতীনও চড়া পর্দায় বলে উঠে:

—আগে নিজের ঘরের বৌটাকে দেখো। তারপর লুকের কথা বলবা—

বদন ডাক্তার এসে পড়েছে। অবিনাশ যতীনের টুঁটিটাই টিপে ধরেছে এবার গোলমাল হৈ চৈ চীৎকার উঠছে। কলরব ওঠে।

নিতাই এবার অন্য ভূমিকা নিয়েছে। আজ তারাই এবার জবাব দেবে অবিনাশকে। ও কয়েকটা কিল ঘুঁষিও পড়েছে অবিনাশের উপর। নিতাই-যতীন আজ নোতুন উদ্যমে আক্রমণ করেছে অবিনাশকে।

অবিনাশও ক্ষেপে উঠেছে। গোলমাল দেখে প্রভাতবাবু বদন ডাক্তার আরও দু'চারজন লোক কোন রকমে ওদের ছাড়িয়ে দিয়েছে। তবু গর্জায় যতীন—জান খেয়ে লিব তোর!

অবিনাশ-এর নাক-মুখ কেটে গেছে। জিবে ঠেকছে নিজের রক্তের নোনতা স্বাদ। আজ তাই মনে হয় চারিদিকের রূপটা যেন বদলে গেছে অবিনাশের।

প্রভাতবাবু বলে—চল এখান থেকে।

দু'চারজন লোক তবু মৃদু প্রতিবাদ তোলে—এ কাজটা ঠিক হয়নি মাস্টার ··খামোকাই অবিনাশকে মারবে ওরা? ইয়ার বিচার হবেক নাই?

কেতুলাল-গেণু দাস এর মধ্যে হিসাব-কিতাব করে ফেলেছে। রিলিফের টাকা, জিনিষপত্র আসছে। ওই জলবন্দী লোকদের জন্য ঘর তৈরী করার কিছু টাকাও এসেছে, তাদের এ সময় গ্রামে ফিরে গেলে সব কিছু গ্রামে গ্রামে সেণ্টার করে সেখানের গ্রাম-সমিতি বা কিছু স্থানীয় লোকের হাতেই তুলে দিতে হবে। তাতে এদের প্রাধান্য থাকবে না। সরকার থেকে সেটার ব্যবস্থা করা হবে।

এই ব্যাপারটাকে তাই তারা এখানেই সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করছে। এ নিয়ে অসন্তোষ আছে—এ গ্রাম ও গ্রামে কথাও উঠছে সে খবরও জানে ওরা। অবিনাশ যে সদরে এটা করানোর চেষ্টা করছে এখানের বেশ কিছু লোকদের সাহায্যে, তাদের মদত দিচ্ছে এখানের মানুষ, মায় প্রভাতবাবুর দল এ খবরও জানে গেণু দাস।

অধর ভটচায-এর এখন স্কুল বন্ধ। আর সেও চায় ইস্কুল বন্ধই থাকুক। তাকে কাজ করতে হবে না। এদিকে রিলিফের চাল, ডাল, ধুতি, কম্বল—মায় নগদ টাকারও কিছু অংশ মিলছে। অধর-বাবু বলে:

—আপনার প্রশ্রয় পেয়েই ওরা এসব করার সাহস পেয়েছে গেণুবাবু। আপনি মহান ব্যক্তি, দয়াশীল-ক্ষমাশীল।

গেণুবাবু ঠা ঠা করে হাসে। হাসি থামিয়ে বলে:

—সইতে হয় অধর। শোননি? যে সয় সেইই রয়। দেখা যাক কি হয়।

কেতুলাল বলে—লোকগুলোও বেইমান। ওদের জন্য দিনরাত খেটে মরছি। সাতমুলুক ঢুঁড়ে এসব আনছি—ওরা তলে তলে নাকি দরখাস্ত করছে। আমাদের বিরুদ্ধে ওই অবিনাশের দলও রয়েছে।

গেণু দাস ক্ষমাসুন্দর স্বরে বলে—আরে এতকাল দেশের কাজ করছো, কথা শোননি? এ আর নোতুন কি ব্যাপার কেতু? তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও, যে যা বলার বলতেই থাকবে। গীতায় পড়োনি, কি হে অধরবাবু?

গীতা পাঠ করা যেন গেণু দাসের নিত্যকর্ম, সে হেডমাষ্টার অধর-বাবুকেই এবার গীতার থেকে প্রশ্ন করে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করে চলেছে। গেণু দাস বলে:

—ওই যে মা ফলেষু কদাচন। ফলের আশা করো না।

কেতুলাল বোঝবার চেষ্টা করে গেণু দাসের বচনামৃত।

অধর মাষ্টারও মাথা নাড়ে—আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। প্রকৃত সত্য কথা।

গেণু দাস জানে তার প্রাপ্তিযোগের কথা। কর্মযোগ-এর পরই প্রাপ্তিযোগ, তার কাছে এইটাই বড় কথা। আর্থিক আমদানি ছাড়াও তার কাছে জমার খাতায় প্রতিষ্ঠা—আর সমাজের মাথায় ওঠার অধিকারটাই অন্যতম প্রধান চাওয়া। তার জন্য সে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে পা ফেলে।

এমন সময় খবরটা এসে পৌঁছায়।

অবিনাশ-এর দলবল নাকি গোলমাল বাধাতে চায়। ওরা এখান থেকে লোকজনদের গ্রামে ফিরে যেতে বলছে। তাই নিয়ে দু'একজন আপত্তি করতেই মারামারি বেধে গেছে ওই স্কুলের মাঠে।

তিনকড়িও ব্যাপারটা দেখে দৌড়ে এসেছে—আজ্ঞে যতীন নেতাই কি বলতে গেইছিলো, তাদের ধরে পিটুচ্ছে অবা।

—সে-কি!

অধর মাষ্টার একটু ঘাবড়ে গেছে। এমনিই ভীতু লোক —আর মনে মনে সে জানে অনেক অন্যায়ই করেছে সে। খাতাপত্রে

রিলিফের হিসাব লিখেছে তাতে শতকরা সত্তর ভাগই জাল। এসব খবর জানতে পারবে ওই গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষগুলো! তাকেও ছেড়ে কথা কইবে না। তার ঘরেও রয়েছে বেশ কিছু ধুতি, রিলিফের কম্বলের গাঁট। সব যদি হাতে-নাতে ধরে ফেলে বিপদ হবে অধরবাবুর।

তাই বলে সে—এসব কি ব্যাপার বড়বাবু? ওরা হামলা করবে এখানে?

কেতুলালও অবাক হয়। গেণুবাবুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেছে এর মধ্যে। গেণু দাস মাথা ঠাণ্ডা মানুষ। রাগলেও সেটার প্রকাশ ঘটে না। গেণু দাস বলে ওঠে—চলো দিখে আসি কেতুলাল কি ব্যাপার!

অধর মাষ্টারও রয়েছে ওদের সঙ্গে। ভয়ে ভয়েই চলেছে সে বাধ্য হয়ে ওদের পিছু পিছু।

অবিনাশ ভিড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চারিপাশে বেশ কিছু লোকজন জুটেছে। উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছে তারা।

নকড়ি, যতিলাল, দুখুরাম আরও দু-চারজন জুটে গেছে। গিন্নিবালাও এসে পড়েছে। তার গালবাদ্যি শোনা যায়ঃ

—ওমা অবাকে নাকি ছাপ্ খুন করে ফেলাইছে শোনলাম। তা বাপু পাঁচজনে ঘিরে বাগে পেয়ে এভাবে মারে? বেচারা কোথাকার—

নিতাই ধমকে ওঠে—তুমি থামো দিকি। ওসব দালালি ছুটিয়ে দোব না?

এমন সময় খোদ কত্তাবাবুকে ঢুকতে দেখে যতীনও মুখ খোলে। নিতাইও নিজের প্রাধান্য জাহির করার জন্য বলে চলেছেঃ

—এখানেও দল পাকাতে এসেছে বড়বাবু? লোকজনরা এখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। খেতে পাচ্ছে। আর ও বলে বেড়াচ্ছে, ভিক্ষের চাল খেতে লাজ লাগে না? ইখানে কেন এসেছিস? গাঁয়ে ফিরে

চল, সরকার ঘর বানিয়ে দেবে, চাষ করার খরচা দেবে, খেতে দেবে। সিখানে বসে সব পাবি।

অবিনাশ প্রতিবাদ করে।

—ওসব কথা বলিনি। শুধোও বসন্তকে কি বলেছি।

গেণু দাস নিতাই-এর কথাগুলো শুনছে। ও একটু অবাক হয়। কথাগুলো আইনের কথা। আর পাকা মাথার কথা। লোকগুলো চলে গেলে রিলিফও বন্ধ হয়ে যাবে এখানে। তাই বাঁধ বাঁধার কাজও সুরু করছে না কেতুলাল, গড়িমসি করছে। গেণু দাস চায় ওদের অভাব-কষ্টটা ষোল আনাই থাকুক, তবেই তার কাছে ওরা মাথা নীচু করে থাকবে বাধ্য হয়ে। গেণু দাসও জানে সামনের সেটেলমেণ্টের আগেই সে ওদের ভাগচাষের জমি নিজের খাসে আনতে পারবে। না হয় এমন পরিস্থিতিতে সে চাষীদেরই উৎখাত করে দেবে সহজেই।

কেতুলাল এবার স্কীম এনেছে এখানের ওই নদীর ধারে একটা কারখানাই করবে, সুগার মিলও হবে। জেলায় কোন কলকারখানা নেই। এখানে সরকারী সাহায্যে গেণু দাসই মিল চালু করবে। তাই এসব জমি তার খাসে আনা দরকার ওই কারখানার নামে।

কিন্তু তার দাবার চালে বাধা দিতে চায় কিছু লোক। অবিনাশ তাদের অন্যতম। সব শুনে গেণু দাস রাগে যেন ফেটে পড়বে।

কিন্তু সংযত স্বরে শুধোয়—এসব কথা বলেছিস্ অবিনাশ? কি প্রভাতবাবু আপনি তো ছিলেন? কি বলেছে ওরা?

প্রভাতবাবু পরে এসেছে। তাই ও সবটা জানে না।

প্রভাতবাবু বলে, ওদের ওসব কথা আমি শুনিনি।

যতীন গর্জে ওঠে—উনি কি জানেন?

আমরা শুনেছি! ওসব কথা বলেছে অবা। অনেক বলেছে ওই শালো!

মেলার সেই রাতের মারের শোধটা আজ নিতে চায় যতীন। অবিনাশ দেখছে নিতাইকে। আজ সে তার স্ত্রী ওই টিয়াকে নিয়েও

ইঙ্গিত করে কথা বলেছে। অবিনাশ দৃঢ়স্বরে গেণুবাবুকে বলে ওঠে :

—নিতাই কি বলেছে শুধোন ওকে? বানে ঘর ভেঙ্গে যাবার পর অনেক বৌ-ঝিদেরই এখানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাদের জড়িয়ে কি বলেছে ও, শুধোন?

নিতাই একটু বিব্রত বোধ করে। গেণু দাসও চুপ করে কি ভাবছে। তার ওই বাড়ির আশ্রিতদের কথাই মনে পড়ে। অবিনাশ বলে :

—মান-ইজ্জত নিয়ে কথা ওঠে যেখানে, সেখানে পাত পাড়ার চেয়ে ভিক্ষে করাও ভালো বড়বাবু। তাই বসন্তকে বলেছিলাম কথাটা :

কি রে বসন্ত বল?

সমবেত লোকদের মুখেচোখে জমাট বিষণ্ণতার ছায়া। গেণু দাস কিছু বলার আগে কেতুলাল বলে ওঠে—এত যদি সম্মান তবে এখানে এসেছিলে কেন?

যতিলাল জবাব দেয়—আপনাদের কাছে হাত পাতিনি বাবু, সরকারের কাছে হাত পেতেছি। তাঁরা দিচ্ছেন—আর আপনারা তাই নিয়ে সর্দারী করছেন ওই যতীন-নিতাইদের নিয়ে। ই ক্যামন কথা!

গেণু দাস অবাক হয়। ওই শীর্ণ বুভুক্ষু মানুষগুলোর মনের অতলে এমনি আগুন রয়ে গেছে ওই বুকের খাঁচার মধ্যে তা ভাবতেই পারেনি।

সমবেত লোকদের মাঝেও গুঞ্জরণ ওঠে। তারা এই ক'দিনে যেন ভিখারীর মত মাথা নীচু করেছিল এখানে ওদের দয়ায়। আজ আসল কথাটা জানতে পেরেছে তাই তারাও প্রতিবাদ করে—ঠিক কথা। ওরা অবাকে মারার কে? ওরা কি খেতে দিচ্ছে হে!

অবিনাশের দুচোখ জ্বলছে। জনতাকে উদ্দেশ্য করে ও বলে ওঠে :

—ভাঙ্গা বাঁধে এক কোদাল মাটি পড়েনি কেনে? দাসমশাই চান নদীর মুখ খোলা থাকুক যাতে আমরা আবার ডুবি। তাই

বলছিলাম—এখানে পাকা কোঠায় ভিখেরী সেজে লপ্‌সি খেতে চাই না। ঘরে ফিরে চলো সব—বাঁধে হাত লাগাও। সরকার—ডি-এম সাহেব সেদিন তোমাদের হাতেই রিলিফের টাকা জিনিষপত্র তুলে দেবে। নিজেরাই ব্যবস্থা করবে তখন।

চারিদিকে লোকজন ক্রমশঃ এখানে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। কাজকর্ম নেই। করারও কিছু যেন নেই তাদের। রাতারাতি ওই গেণু দাস-কেতুলালের পায়ের তলে ফেলে ওদের যেন গোলাম করে রেখেছে। আজ হঠাৎ ওই সমবেত মানুষগুলো বুঝেছে এদের চালটা। অবিনাশ-এর রক্তঝরা বলিষ্ঠ কঠিন মুখচোখে কি দীপ্তি ফুটে ওঠে।

গেণু দাস বলে ওঠে—লেকচার শেষ হয়েছে তোর?

অবিনাশ চাইল ওর দিকে। গেণু দাস বলে:

—যার খুশী থাকবে, যার খুশী চলে যাবে। তাতে কেউ বাধা দেবে না। তবে এখানে গোলমাল করতে এলে পুলিশেই খবর দোব অবিনাশ।

অবিনাশ জানে সে সাধ্য ওদের আছে। এখন এ সময় কোন গোলমালও করতে চায় না সে। এই অসহায় মানুষগুলোকে নিরাশ্রয় করাও তার পক্ষে ঠিক হবে না। তবু তার এই কথাগুলো সমবেত মেয়েছেলে লোকজনের মনে একটা প্রশ্ন তুলেছে, ওরাও চুপ করে এখানে পড়ে থাকবে না সেটা বুঝেছে অবিনাশ।

তাই সে বের হয়ে এল।

অবশ্য নিতাই তখনও গজরাচ্ছে—ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছিস যে? পুলিশের ভয়ে!

বদন ডাক্তারও ব্যাপারটা দেখেছে। সে চতুর ব্যক্তি। দেখেছে ওই বুভুক্ষু জনতার শীর্ণ মুখে প্রতিবাদের কাঠিন্য, যদিও সেটা সোচ্চার হয়ে ওঠেনি কিন্তু তার অস্তিত্বটাকে অস্বীকার করা যায় না। সেটা রয়ে গেছে। তাকে ওদের নিয়েই চলতে হবে। না হলে তার ডাক্তারি অচল হয়ে যাবে। তাই অবিনাশকেও চটাতে চায় না সে। নিতাই-এর কথায় বলে ওঠে বদন:

—থাম নিতাই। বাবুদের কথার মাঝে তোর ফোড়ন কাটা কেন? সবতো মিটে গেল।

একজন সব ব্যাপারটাই দেখেছে দূর থেকে। টিয়া ওই গোলমাল শুনে বের হয়ে এসেছিল, এমন গোলমাল এখানে প্রায়ই বাধে তুচ্ছ কারণ-অকারণে। এতগুলো মানুষ কাজকর্ম নেই শুধু বসে গড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে, মনে রয়েছে জ্বালা। তাদের পক্ষে এমন গোলমাল বাধানো স্বাভাবিক ব্যাপারই।

টিয়া এখান থেকে একটু আলাদাভাবে রয়েছে। আর দেখেছে টিয়া যতীনের বুড়ি মায়ের যত্নটাও। সেদিন অবিনাশ তার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবার পর রাগে ফুলছিল টিয়া। অবিনাশের অবস্থাটা সে বুঝেছে, আর কারণটাও কি তা বোধহয় ও গিরিবালার মুখের কথাগুলোয় অনুমান করেছিল। তাই টিয়ার অভিমানই হয়।

যতীনের মা জানে এখানে টিয়াকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যটা। বাবুদের ব্যাপার সে অনেক কিছুই জানে। টিয়ার রূপ-যৌবনের বাহারও দেখেছে বুড়ি। তাই টিয়াকে বলে:

—মরদ! এমন সোয়ামীর দাম কী বাছা? বলে না, ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারার গোঁসাই! যতীনের মাও অবিনাশের ওই গোলমালে আজ খুশী হয় নি। তাই টিয়াকে অবিনাশ সম্বন্ধে দুচার কথা শুনিয়ে দেয়। বুড়ি বলে:

—মুরদ নাই দাপানি আছে। এতদূর এলি একবার দেখা করে গেলি না বৌ-এর সাথে!

টিয়ার অভিমানী মন গুমরে ওঠে। ও বলে:

—বান কমলেই বাবুদের বলে দাও যতীনের মা, আমাকে সহরে পাঠিয়ে দেবে। ভাইদের ওখানেই চলে যাবো।

যতীনের মা কথাটা লুফে নিয়ে বলে:

—তা বাবুতো ইদিকে আসেন কথাটা নিজেই বলো। দয়ার শরীর বাবুর আর গাড়ি টেরাক তো যাতায়াত করছে, এ আর এমন কথা। বললেই সহরে যাবার ব্যবস্থা হবে। তাই বলছিলাম

বাছা গোয়ামী আমাদেরও ছিল, এমন ছিল না। বলে না—ভাত দেয় কি ভাতারে? ভাত দেয় আমার গতরে। গতর খাটাবে খাবে। এমন নিষ্কম্মা সোয়ামীর মুখে মারি আধোয়া খ্যাংরা!

টিয়া চুপ করে কথাগুলো শুনেছে। অবিনাশের উপর রাগটা জমেছিল। এখান থেকে চলে যাবার সুযোগই খুঁজছে সে। সহরে চলে যাবে—সেখানে বাঁচার একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

সন্ধ্যা নামে।

চারিদিকে ঘনিয়ে আসে জমাট অন্ধকার। ওপাশে বাবুদের বাড়ি নোতুন বাংলোয় বিজলীর বাতি জ্বলে। ইস্কুল বাড়িটায় কয়েকটা বাতি লাগানো হয়েছে। কিন্তু বাকীটা সব অন্ধকার। এবাড়ির বাগানের গাছ-গাছালিতে আঁধার ঘনতর হয়ে ওঠে। মিটমিটে হ্যারিকেনের আভা ওই জমাট অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

টিয়া কথাটা ভেবেছে। এখান থেকে চলে যাবে সে সহরে। তাই বড়বাবুকে দেখে এগিয়ে যায় সে ওই দিকে।

গেণু দাস সন্ধ্যার পর একটু বেড়াতে বের হয়। গোয়ালবাড়ি খামারবাড়ি সব কিছু একবার তদারক করে সে এইদিকে বাংলোর দিকে চলেছে, হঠাৎ টিয়াকে দেখে দাঁড়ালো।

টিয়া দেখছে লোকটাকে। সেই ঝড়-বাদলের রাতে বিদ্যুতের ঝলকে দেখেছিল তাকে। তার চোখের সেই জ্বলন্ত চাহনিটা ভোলেনি টিয়া। আজ এই আবছা তারাজ্বলা অন্ধকারে, গাছের ছায়া অন্ধকারেও সেই চাহনিটাই যেন আবার দেখছে সে।

টিয়া, তবু বলার চেষ্টা করে—আমাকে সহরে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। দাদার ওখানেই যাবো।

গেণু দাস ওর দিকে চাইল। গেণু দাস বলে ওঠে:

—কেন? এখানে তোমার অসুবিধা হচ্ছে? যতীনের মাকে বলে দিয়েছি—সব দেখভাল করবে। তা হঠাৎ—

গেণু দাস দেখছে টিয়াকে। এ যেন অবিনাশের ঠিক বিপরীত-ধর্মী একটি প্রাণী। অবিনাশের কঠিন মূর্তির তুলনায় এ অনেক অনেক কোমল, অনেক সুন্দর। গেণু দাস জানে মেয়েটির মনের অতলের কামনাটাকে। সে অনেক পেতে চায়। আর একে হাতে রেখেই গেণুদাস অবিনাশকে একটা আঘাত হানবে। তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিজেই সবকিছুর দখলদার হয়ে বসবে। লোভী মানুষটার মনের অতলে সেই সত্বাটা জেগে ওঠে। তার দাবা বড়ের চালটা মনে আসে। তাই টিয়াকে তাকে হাতে রাখতে হবে—অবিনাশকে চরম আঘাত দেবার জন্য। গেণু দাস বলে দরদভরা স্বরে—তা কী অসুবিধা হচ্ছে তোমার এখানে ?

টিয়া জানায়—না। অসুবিধে কিসের ? ভালোই আছি।

—তবে চলে যেতে চাইছো কেন ? গেণু দাস ওর কাছে এগিয়ে এসেছে। দেখছে মেয়েটাকে। ওর নিটোল যৌবনমদির দেহ, ওর সলজ্জ চাহনি, আর সংকোচভরা কথাগুলো গেণু দাসের মনের শুন্যতার মাঝে একটা সাড়া এনেছে।

টিয়া যেন ওর প্রশ্নে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবু জানায় টিয়া :

—চুপচাপ বসে বসে খাব কদ্দিন ?

হাসছে গেণু দাস। একটা সমস্যা সমাধান-এর কথা ভাবছে সে। হঠাৎ গেণু দাস বলে ওঠে :

—মেয়েদের স্কুলে চাকরি করবে ? ধরো বেয়ারা তো চাই। খাতাপত্র ক্লাসে নিয়ে যেতে হবে। দিদিমণিদের ফাই-ফরমাস খাটবে। মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকবে স্কুল খুললে। খাওয়া-থাকা ছাড়াও মাস মাস কিছু টাকা মাইনে পাবে। তাতে রাজী থাকতো বলো।

টিয়া কথাটা শুনে চমকে ওঠে। এভাবে তার মাথা উঁচু করে বাঁচার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি।

গেণু দাস-এর সন্ধানী দৃষ্টি ওর মুখে পড়েছে। চতুর লোকটা জানে তার দাবার গুটির চালগুলো ব্যর্থ হয় না। তার একমাত্র

লক্ষ্য সব কিছু পাওয়া—সব কিছুকেই গ্রাস করা। তার জন্য গেণু দাস ভেবে-চিন্তে পা ফেলে।

গেণু দাস দেখেছে মেয়েটার চোখে-মুখের নীরব খুশীর ঝলক। এটাই সে আশা করেছিল। তবু গেণু দাস নিরাসক্তস্বরে জানায়ঃ

-- অবশ্য কথাটা তুমি ভেবে দেখো। তারপর ধরো অবিনাশ, মানে তোমার স্বামীর মতামতটাও বড় কথা।

টিয়ার অভিমানভরা মন ফুঁসে ওঠে। আজ সে নিজের পরিশ্রমে ভালোভাবে ভালো পরিবেশে বাঁচার একটা পথ পেয়েছে।

তাই টিয়া বলে—চাকরি করবো আমি, তার মতামতের কি থাকবে এতে।

গেণু দাস হাসছে, ওর হাসিটায় কোন সাড়া ওঠে না। নীরব অন্ধকারে যেন একটা চাপা খসখসানির শব্দ ওঠে, যেন শুকনো ঝরাপাতার উপর দিয়ে একটা বিষধর সাপ বুকে হেঁটে চলেছে।

গেণু দাস বলে—মাথা গরম করে কিছু করো না। ক'দিন পরই স্কুল খুলছে। কাল বড়দিদিমণি আসছে, আমি বলে রাখবো। তুমিও ভেবে-চিন্তে দ্যাখো। শেষকালে আমি যেন দোষী না হই বাপু।

টিয়া কথাটা ভাবছে। গেণু দাস চলে গেছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে টিয়া। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল সে।

যতীনের মা ছায়ার মত এগিয়ে আসে।

ফিসফিসিয়ে ওঠে বুড়ি—দেখলে তো বাছা, বড়বাবুর আমাদের দয়ার শরীর। কেমন খাসা চাকরির কথাটাও পাকা করে দিল। তা'হলে বাছা থেকে যাও এখানেই। ওই ভাঙ্গা ভিটেতে অভাব আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাঝে গিয়ে কি করবা? গতরপাত করে এতদিন তো রয়েছিলে, তা দেখেছে সেই মানুষটা?

টিয়া জবাব দিল না। চুপ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। যতীনের মা দেখছে ওকে। জানে বুড়ি—প্রথম প্রথম এমন একটা সমস্যার কথা মনে আসবেই মেয়েটার। কিন্তু ওই চাকরি আর এখানের জীবনের মোহটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা কষ্টকরই। বুড়ি এমন অনেককেই দেখেছে। তেজী বেবশ বুনো ঘোড়ার মত অবাধ্য

অনেকেই গেণু দাসের ধুলোপড়ায় মাথা নীচু করেছে, পোষ মেনেছে।

বুড়ি এইখানেই সেই ঘটনা একাধিকবার ঘটতে দেখেছে।

টিয়া কথাটা ভেবেছে।

মনে পড়ে কিছুদিন আগেকার এখানের শান্ত পরিবেশের কথা। আমবাগান-এর মধ্যে বিরাট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে স্কুল—মেয়েদের স্কুলের পাকাবাড়ি। ওদিক এদিকে বোর্ডিং আর আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছোট ছোট বাড়িগুলো। মাষ্টারবাবু, দিদিমণিদের বাসা। গ্রামের ঘিঞ্জি পরিবেশ নয়, গ্রাম একটু দূরে। ওপাশে বড়বাবুর সাজানো বাংলো। চড়াই-এর ওদিকে নদীর ধারে খামার বাড়ি, গোয়ালবাড়ির সীমানা সুরু হয়েছে।

এদিকটা এই এলাকার মধ্যে সাজানো। কেতুলালকে জেলার অন্যতম নেতা বানিয়ে গেণু দাস মদত দিয়ে এখানের রূপ বদলেছে। বাইরের দিদিমণিরাও এখানে থাকে। বাড়ীর মেয়েরাও স্কুল বোর্ডিং-এ থাকে। এ যেন স্বতন্ত্র একটি পরিবেশ। টিয়ার মনে হয় এখানে থেকে চাকরিটা সে নেবে। তবু ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। সহরের নোংরা বস্তির মধ্যে ভাই বৌদির দয়ায় পড়ে থাকার চেয়ে এখানে থাকাই ভালো। তাছাড়া অবিনাশের আপত্তি হবে না। হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এখানে সে আগেও এসেছে দুধের রোজ দিতে, না হয় হাটবাজার করতে। চেনা জায়গা ভালোই হবে তার।

টিয়া আজ মনস্থির করেই ফেলেছে। মনে মনে সে এখানের জগতের একজন হয়ে গেছে।

সবিতা সান্যাল বাইরের থেকে এখানে চাকরী করতে এসেছে স্কুলে। স্বামী থাকেন দুর্গাপুরে, সবিতা এখানের স্কুলে এসেছে, তার ওখানেই থাকবে টিয়া। স্কুলের কাজকর্ম করবে। আর সবিতাও একা থাকে, তাই টিয়াকে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। ছিমছাম ভদ্র ধরনের মেয়েটিকে পছন্দ হয় তার।

গেণু দাসই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সবিতা বলে—কাল থেকেই চলে এসো আমার বাসায়। দু'জনে থাকা যাবে।

টিয়া তার নতুন মনিবকে দেখে খুশী হয়েছে, তবু বলে টিয়া :

—মাঝে মাঝে বাড়িতেও যেতে হবে আমাকে দিদিমণি। বেশী দূর নয়। নশীপুরেই ঘর আমাদের। ওই পাশের গাঁয়ে।

হাসে টিয়া—ঘর আর নাই। বানে ভেসে গেছে সব।

কথাটা বলে কেমন চমকে ওঠে টিয়া। কি যেন একটা সর্বনেশে কথাই বলে ফেলেছে সে। সবিতা ওর দিকে চাইল।

টিয়ার সিঁথিতে সিন্দুরের বিবর্ণ দাগ, ওর পোশাক দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না যে কোন ঘরের বৌ! নিজেরও স্বামী আছে। দু'জনেই দু'জনের জন্য ভাবে। তাই সবিতা টিয়ার ইঙ্গিতটা বুঝে বলে :

—তা যাবে বৈকি।

টিয়ার সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে।

অবিনাশের খবরটা প্রভাতবাবুর কাছেই পেয়েছে। গ্রামেও নেই অবিনাশ, সে এখন সদর সহরে যাতায়াত করছে আর সদ্য জেগে ওঠা গ্রামের মানুষগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত। অবিনাশের খবর প্রভাত-বাবুই আনে।

প্রভাতবাবু বলে—ও ভালো আছে টিয়া।

টিয়া জবাব দিল না। লোকটার উপর জমেছে শুধু অভিমানই। এত বিপদের সময় তাকে অচেনা অজানা জায়গায় ফেলে রেখে একবার খোঁজ নেবার দরকার বোধ করে না অবিনাশ।

কারণটা অনুমান করেছে টিয়া। তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই খারাপ ভেবেছে অবিনাশ। তাই ঘৃণাভরে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

তবু টিয়া বের হয়ে এসেছিল আজ অবিনাশকে এখানে দেখে। দেখেছে দূর থেকে ওই নিতাই-যতীনের দল তাকে ঘিরে ফেলেছে। আর অসহায় বুভুক্ষু মানুষগুলোর হয়ে কথা বলতে গিয়ে অবিনাশ যেন অন্যায় করেছে।

টিয়া বুঝতে পারে না অবিনাশ কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামায়। এই পরের জন্য ভাবতে গিয়ে টিয়া দেখেছে অবিনাশ পদে পদে ঠকেছে। তার ভাগচাষের জমিগুলোই সব মালিক আগে কেড়ে নিতে হাত বাড়িয়েছে। তার ঘরের ধান চাল মায় টাকা পয়সা অবধি অবিনাশ লোককে বিলিয়ে দিয়েছে আগে, এ নিয়ে টিয়াও বহুবার প্রতিবাদ করেছে। কথা কাটাকাটিও হয়েছে। আর অবিনাশ চটে উঠে বলেছে টিয়াকে—আমাদের বাড়তিটুকু অপরকে দিলে দোষ?

টিয়া বোঝাতে পারেনি ওকে।

এই নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল মতান্তর, আর ব্যবধান। টিয়াও বলেছে—ওই পরোপকার দেশসেবা করতে হয় কেতুবাবুর মত করো, তা নয় শুধু সব বিলিয়ে নিজেরা উপোস দিতে পারবো না।

টিয়ার অভিমানী মন গুমরে ওঠে বার বার। নিজের অধিকারের প্রশ্ন তুলেছে—তবে জেনে-শুনে বিয়ে-থা করেছিলে কেন?

বঞ্চিতা একটি নারীমন বার বার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু অবিনাশকে সে টলাতে পারেনি তার পথ থেকে।

আজ তাই ওদের মাঝে অবিনাশকে দেখে টিয়া একটু বিরক্ত হয়। এখানে এসে ওসব কথা না বললেই পারতো সে। অবিনাশকে দেখেছে সে, রক্ত ঝরছে নাক দিয়ে। বলিষ্ঠ কঠিন মানুষটা তবু নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গেণুবাবু কেতুবাবুরা এসে পড়েছেন।

কিন্তু অবিনাশ এতটুকু ঘাবড়ায় নি। সেও মাথা উঁচু করে ওদের সঙ্গে সমানে সওয়াল জবাব করে চলেছে। যেন তার কথাটাই বেদবাক্য। টিয়া লোকটার গোঁয়াতু'মিটাকে সহ্য করতে পারে না। এখানে এসব কথা না বললেও চলতো।

টিয়া মনে মনে ওই অবিনাশের উপর চটে উঠেছে। শুধু তার জীবনেই নয়, নিজের জীবনেও ওই অবিনাশ এমনি ভুলগুলো বার বার করে এসেছে, ঠকেছে আর ঠকিয়েছে টিয়াকেও।

সেই শূন্যতার জ্বালা টিয়ার সারা মনে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওই দুঃখকষ্টের জীবন আর তার মাঝে গোঁয়ার একটা লোককে নিয়ে ঘর বাঁধার সব স্বপ্ন তার হারিয়ে গেছে। আজ সে তাই এখানের সহজ নিশ্চিন্ত জীবনের কথাই ভাবে টিয়া।

গোলমাল থেমে গেছে। ইস্কুল-বাড়ির চত্বরে লপ্‌সির জন্য পাতা পেতে বসে ওরা কলরব করে চলেছে, এছাড়া আর করণীয় কিছুই তাদের নেই।

বাবুরাও ফিরে গেছে বাংলোয়। তাদের সামনে অনেক কাজ।

অবিনাশ একাই ফিরছে। আজ তার মনে বেজেছে এদের আঘাত আর অপমানটা। ওই কথাটা সে ভুলতে পারেনি। তার স্ত্রীকেও এখানে পাঠিয়েছে সে। টিয়া এদেরই আশ্রয়ে দয়ায় টিকে রয়েছে এখানে। আরও কি যেন ইঙ্গিত করেছিল যতীন টিয়ার সম্বন্ধে। অবিনাশ ঠিক জানে না টিয়া কোথায় আছে। খবরটা নেবারও সময় হয়নি কারো কাছে। গোলমাল বেধে গিয়েছিল তার আগেই।

অবিনাশ বাগানের মধ্যে এখান-ওখানে ছড়ানো বাড়িগুলোর মধ্যেকার পথ দিয়ে চলেছে। টিয়াকে তার দরকার। ওকেও নিয়ে যাবে এখান থেকে। এভাবে অপমান সহ্য করে এখানে রাখবে না ওকে, জল নেমে গেছে। ঘরেই যাবে টিয়া।

তবু হেঁটে যাওয়া যাবে, আর গ্রামঘরেও ফিরতে হবে তাদের। এখানের পালা চুকিয়ে যেতে চায় অবিনাশ।

হঠাৎ একটা আমগাছের নীচে টিয়াকে দেখে দাঁড়ালো। ওদিকে বাড়িটার গায়ে সবুজ বোগেনভিলা লতায় এসেছে গাঢ় লাল হলুদ পাতা ফুলের ভিড়। টিয়াকে দেখে চাইল অবিনাশ। এগিয়ে যায় সে।

ক'দিন ঝড় বয়ে গেছে এই মুলুকে। ইস্কুল বাড়ির আশ্রিত মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দেখেছে অবিনাশ, ওদের মুখচোখে শীর্ণতা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, কাপড়-চোপড় ময়লা, পুতিগন্ধময়। ওদের চোখে ফুটে উঠেছে হতাশার অন্ধকার।

কিন্তু টিয়ার দিকে চেয়ে অবাক হয় অবিনাশ। ওই দারিদ্র্য-শীর্ণতা-কষ্টের কোন চিহ্ন ওতে নেই। হতাশার ছায়া ওর উজ্জ্বল চাহনিকে ম্লান করেনি। বরং ওর সারা দেহে ফুটে উঠেছে একটা লাস্য। শাড়িখানাও ফর্সা, পাটভাঙ্গা, সদ্য স্নান সেরে পিঠে একরাশ চুল মেলে দিয়েছে।

অবিনাশ দেখছে ওই টিয়াকে।

টিয়াও দেখেছে ওই ধ্বংসস্তূপের মত লোকটাকে। ক'দিনে ওর বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহরাটায় এসেছে শীর্ণতা, আর চোখ দুটোর চাহনি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, কপালে নাকে ওদের মারের দাগ। আর ওই রুক্ষতার মাঝে ও যেন কঠিন প্রতিবাদমুখর একটি প্রাণী।

টিয়া শুধোয়—হাঁ করে দেখছো কি?

অবিনাশ বলে ওঠে—এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে। আজই।

চমকে ওঠে টিয়া, ওই শূন্যতার মাঝে ধ্বংসপুরীতে গিয়ে সাপখোপের মধ্যে আর নিদারুণ অভাবের মধ্যে বাঁচতে সে পারবে না।

টিয়া জবাব দেয়—ওখানে গিয়ে থাকবো কোথায়? ঘর তো ভিটেপুরী হয়ে গেছে। আর তুমি তো পথে পথেই ঘুরছো শুনলাম। কোথায় কার কাছে থাকবো?

অবিনাশ ওর দিকে চাইল। ও দেখেছে টিয়ার চোখের ওই জ্বালাটাকে। টিয়া আজ কঠিন স্বরে বলে:

—আমার কথা কোন দিন ভেবেছো? সব হারিয়েও তবু জ্ঞান হয়নি তোমার? আজ এসেছ এদের এখানে ওই গেণুবাবু কেতুবাবু-দের সঙ্গে টক্কর দিতে? পারবে তুমি ওদের সঙ্গে? তার জবাবও দিয়েছে ওরা। তোমার নাক-মুখ-এর ছবিটা দেখলে বুঝতে পারতে।

অবিনাশ আজ এই জবাব শুনবে তা যেন ভেবেছিল। জীবনে নিজের বলতে কোন কিছুর উপর মোহ তার কমই। টিয়ার উপর

একটু দুর্বলতা তার তবু ছিল। কিন্তু সেই টিয়াই আজ তাকেও ভুল বুঝেছে। আর টিয়ার কথার জ্বালা তাকে ব্যথিত করেছে ওদের প্রহারের চেয়েও অনেক বেশী মাত্রায়।

আর্ত কণ্ঠে অবিনাশ বলে ওঠে—তাহলে গেণুবাবুরাই তোকে দলে টেনেছে বল টিয়া? তা ভালোই। কথাটা কানে এসেছিল আগেই—

টিয়া তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্ন করে· কি শুনেছিলে? জবাব দাও।

অবিনাশ ওর দিকে চাইল। তেজী মেয়েটার দু'চোখ জ্বলে উঠেছে। টিয়া বলে ওঠে ঃ

—তা বলার সাহস তোমার নেই। নিজে জ্বলছো··তাই আমাকেও সারা জীবন জ্বালাতে চাও। তাই বলছি ওসব আমি সইবো না। নিজে যদি বদলাও··আমি ঘরে ফিরবো। নাহলে ওই ধ্বংসপুরীতে একটা অপদার্থ লোকের কাছে আমি ফিরবো না। তাতে তুমি আমার সম্বন্ধে যা ভাবো—আমার কিছুমাত্র যায় আসে না।

অবিনাশ চুপ করে ওর কথাগুলো শুনছে। টিয়া কথাগুলো বলে ফিরে ওদিকের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকলো। অবিনাশ কি বলতে চায়—কিন্তু টিয়ার সে কথা শোনার প্রয়োজন নেই। সে আজ অবিনাশকে জবাব দিয়ে গেছে কঠিন স্বরে।

অবিনাশ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে। এই ছায়াঘন আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধতা তার মনের জ্বালাটাকে কমাতে পারেনি। আজ মনে হয় তার সব হারিয়ে গেছে।

বানের জল নেমে গেছে মাঠ থেকে, সারা দিগন্তজোড়া প্রকৃতির বুকে শুধু ক্ষতের দাগের মত ঠাঁই ঠাঁই জেগে আছে মরা খাদ—বালির স্তূপ আর ঘোলা জলের সঞ্চয়। শান্ত প্রকৃতির বুকে জেগে আছে নিরাভরণ শূন্যতা—নিঃস্বতার মাঝে মাথা তুলে চলেছে একটি মানুষ। তারও বুকজোড়া অমনি ক্ষত, আর নিঃস্বতা। অবিনাশ ভাঙ্গা বাঁধের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। নদীর মুখটা যেন 'হাঁ' হয়ে আছে কি ক্ষুধায়, আজ সর্বনাশা বন্যা তাদের সব সম্পদ—সব সঞ্চয়-

টুকুকে কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব ভিখারীর দলে পরিণত করেছে ওই বন্যায় সব হারিয়েছে তাদের।

—অবা।

অবিনাশ কার ডাকে চাইল।

রামু মোড়ল, দুঃখীরাম, শেখপাড়ার আইনুদ্দি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁধের ভাঙ্গন মুখে। রামু মোড়ল বলে ঃ

—বাঁধ কি বাঁধা হবে না অবা? আমরা কি দাঁড়িয়ে ডুববো আবার? দশ-বিশখান গেরামের লোক রাজী হয়েছে। ডেকে-ডুকে আমরাই পারব ভালো বাঁধ বাঁধতে।

অবিনাশের বুকের জ্বালাটা এবার এক কাঠিন্যে পরিণত হয়। সে দেখছে ওই মানুষগুলোকে। ওরা হাত লাগাতে চায়, নিজেদের ভাগ্যকে আবার নোতুন করে গড়তে চায়। গড়তে চায় প্রতিরোধের বাঁধ। সব অন্যায় অত্যাচার, প্রলোভনের বন্যাকে তারা রুখতে চায়। অবিনাশের মনে পড়ে গেণুবাবুর কথাগুলো। ওদের দেখিয়ে দিতে চায় অবিনাশ তারা এত মহামারীতেও মরেনি। রক্তবীজের প্রাণশক্তি নিয়ে তারা বেঁচে থাকবে লড়াই করবে জীবনের সঙ্গে। বাঁচার লড়াই!

—অবিনাশ!

আইনুদ্দি এগিয়ে আসে—তোরাও আয় অবিনাশ। লোকের অভাব হবে না। এ বাঁধ আমরাই বাঁধবো। আর কেউ না আসুক।

অবিনাশ যেন অনুভব করছে সূর্যের উত্তাপ। তার সব হারানো ব্যথাভরা মনটা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অবিনাশ বলে ওঠে ঃ

—হ্যাঁ। আইনুদ্দি চাচা, রামুদা—বাঁধ আমরাই বাঁধবো। ঢোল সহরৎ করে দাও। কাল থেকেই বাঁধে মাটি পড়বে।

ব্যাপারটা দেখেছিল সবিতা।

তার বাসাতে এসে উঠেছে টিয়া। মেয়েটা কাল থেকেই কাজে লেগেছে, মেয়েটার হাসিখুশি ভাব, তার চটপটে কাজকর্মগুলো

সবিতার মনে ধরেছে। এক-আধটু লেখাপড়াও জানে। সহরে মানুষ হয়েছে তাই। এখানে যাদের আগে পেয়েছিল কাজ করার জন্য তাদের থেকে টিয়া অন্য রকমের, আর মন দিয়েই কাজ করে।

ঘরদোর গুছিয়েছে সুন্দরভাবে।

সবিতা ঘরে বসেছিল। দুর্গাপুরে তার স্বামীকে চিঠি লিখছিল —লোকটা একা বাসায় থাকে সেখানে, সবিতাও তাকে ছেড়ে এই পাড়াগ্রামে এসেছে। মাঝে মাঝে বিশ্রী লাগে। তাই চিঠি লেখার সময় ওরা দুজনে যেন কাছাকাছি এসে যায়, এই সান্নিধ্যটুকু সবিতা মন দিয়ে অনুভব করে।

হঠাৎ বাইরে টিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে চাইল। জানলার বাইরে গাছের নীচে টিয়ার সঙ্গে অবিনাশকে দেখে একটু অবাক হয়েছে সে। ক্রমশ বুঝতে পারে ওদের সম্পর্কটা। বলিষ্ঠ ওই অবিনাশের চোখে-মুখে দেখেছে সবিতা কি প্রতিবাদের কাঠিন্য, মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো—কাপড়টা ময়লা, তবু তার ব্যক্তিত্ব যেন ওই রুক্ষতার মাঝেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

ওদের উত্তেজিত কথাগুলো শুনেছে। সবিতা ঠিক জানে না ওদের ব্যাপারটা, তবু সরে এসে কাজে বসলো। কিছুক্ষণ পর টিয়াকে ঢুকতে দেখে চাইল। ওর মুখ-চোখ থমথমে। সবিতা শুধোয়:

—কি রে? নিতে এসেছিল নাকি তোকে তোর স্বামী?

টিয়া চাইল দিদিমণির দিকে। ওর মনে তখনও ঝড় বয়ে চলেছে। অবিনাশ আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু টিয়াই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ওর ওই খেয়াল আর গোঁয়াতুমিকে সে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু সেই কঠিন কথাটা দিদিমণিকে জানাতে কোথায় বাধে তার। টিয়া চুপ করে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। বেলা হয়ে গেছে—এখনও রান্নার কাজ বাকী।

মাছ-এর ঝোল-এর সুন্দর গন্ধ উঠছে। টিয়া রাঁধতে পারে ভালোই। ভাতও হয়ে গেছে। ফ্যান ঝেড়ে ভাতগুলোকে ঢাকা দিয়ে রাখছে। জুঁই ফুলের মত কার্তিক কলমা চালের ভাত—হঠাৎ

টিয়ার মনে পড়ে অবিনাশের কথা। লোকটাকে আজ নির্দয়ভাবেই তাড়িয়ে দিয়েছে সে। কোথায় রয়েছে—কি খাচ্ছে—খেতে পাচ্ছে কিনা তাও জানে না। নিজের এই সহজ জীবনের সঙ্গে অবিনাশের ওই কষ্টের জীবনটার পথ যেন অনেক দূরেই সরে গেছে। টিয়াই সরে এসেছে। সবিতা শুধোয় ওঘর থেকে :

—খাবার হল টিয়া ?...

সবিতার কদিন স্কুল ছিল না, দুর্গাপুর থেকে ফিরে এসেছে—কাল পরশু থেকেই স্কুলবাড়িটা খালি হয়ে যাবে, স্কুলও সুরু করবে তারা। আজও বেলাতেই খেয়ে-দেয়ে একটু জিরোবার কথা ভাবছে। রান্নাঘরে ঢুকে টিয়ার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো।

টিয়াও যেন ধরা পড়ে গেছে, দিদিমণির সামনে তার মনের অসহায় ভাবটাকে সে চাপতে চায়। তাই ওটাকে চেপে টিয়া কোনরকমে অশ্রুভেজা স্বরে জানায়—হয়ে গেছে দিদিমণি।

সবিতা বাইরে থেকে জানায়—জায়গা হলে ডাকবে।

সরে এল সবিতা। মেয়েটার মনের এই যন্ত্রণাটাকে সে হঠাৎ দেখে ফেলেছে। সবিতা তবু টিয়াকে সেই কথাটা জানতে দিতে চায় না।

...গেণু দাস এর মধ্যে বেশ কছু লোকের সই-সাবুদ নিয়ে সদরে দরখাস্ত দিয়েছে বন্যাপীড়িত অঞ্চলের জমি-জায়গার খাজনা মকুব করার জন্য। বদন ডাক্তার এ কাজের নেতা। লোকটা কিছু দিনের মধ্যেই হঠাৎ মাতব্বর হয়ে পড়েছে। বদন ডাক্তারের মনে একটা ফিকির চিরকালই বাসা বেঁধে থাকে। এক-একবার এক-এক পথে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছে। তাই কখনও হামিওপ্যাথিক ডাক্তার, কখনও ধান-চালের ব্যাপারী, কখনও গরুর ডাক্তার, কখনও দেশসেবক।

আর এবার দেশসেবার কাজে নেমে তবু কিছু হাতয়ে এনেছে আর দেখেছে এখানে মান-খাতিরও মেলে। বানের পর বদন

ডাক্তারই এবার গেণুবাবুকে বলে এই দরখাস্তের সই সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে দু'একটা গ্রামে মিটিংও করেছে। অবশ্য অন্য সকলের চেয়ে এতে গেণু দাসই লাভবান হবে বেশী, খাজনা তাকেই বেশী দিতে হয়, সুতরাং লাভটা তারই হবে।

তাছাড়া বদন ডাক্তার এখন কেতুবাবুদের লোক, তাই মান-খাতিরও পাচ্ছে। আর মিটিং-এ বদন বলে জনতার সামনে :

—ঘর গড়ার টাকাও আসছে।

লোকগুলো গ্রামের ভিটেপুরীতে ফিরে যাচ্ছে বাধ্য হয়ে কারণ আশ্রয় গড়ে তুলতে হবে। জমির অধিকাংশ গেছে বালিতে ঢাকা পড়ে, মাঠে ধানও নেই। অন্য ফসলগুলোকেও বাঁচাতে হবে : তাই অনেকেই বলে—তা ট্যাকা কবে দিবেক গ ?

…এরা এমন বন্যায় ডুবেছে মাঝে মাঝে। এসব কথাও শুনেছে, আর দেখেছে শেষকালে তাদের মহাজনদের কাছেই হাত পাততে হয়েছে। গেণু দাস, নিমাইবাবুদের ঘরে কম দামে চলে গেছে তাদের জমি-জারাত। কোন সুরাহাই তেমন হয় নি।

…আইনুদ্দি শেখ বলে ওঠে :

—ট্যাকা দিবেক গোরে গেলে। ধান-ট্যাকা এসব তো ফি-বারই দোব বলো, তা পেয়েছি কিছু ?

বদন ডাক্তার ওদের কথাগুলো শুনে একটু ঘাবড়ে যায়। কয়েক দিন ধরে ওই কথাই শুনছে লোকগুলো। এবার তারা সাফ জবাব চায়।

তাই গোকুল বলে ওঠে—পাবা কাঁচকলা। গাঁট গাঁট কাপড়—ইয়া ইয়া কম্বলের গাঁট এসেছিল, ক্ষুদিরাম-নকুল এরাই নামিয়েছে। তা সেগুলান কুন দিকে গেল হে ডাক্তার ?

বদন ঘাবড়ে যায়। ওসব কোথায় গেছে তা জানে না বদন, তবে খানদুয়েক কম্বল আর গোটা পাঁচেক শাড়ি সে হাতিয়েছে। এবার সেগুলোর কথাই বোধহয় বলে ফেলবে তারা। গুপীনাথ বলে :

—সে সব গেছে কত্তাদের ঘরে। নাহয় আবার ফিরতি ট্রাকে সদরের দোকানেই চলে গেছে। তু শালোরা হাত গায়ে দিয়ে থাকিস তাই থাকবি। কম্বল কি করবি র‍্যা ?

তোমাদের বাড়ি-ঘরের ট্যাকাও অমনি চালান হয়ে গেছে দাদা। তাই বলছিলাম বাঁশ তালপাতা শন খড় দিয়েই কোঠাবালাখানা বানাও। বর্ষায় মাথা গুঁজতে হবেক তো ?

ওদের চোট জবাবে বদন ডাক্তার এবার একটু টসকে গেছে। দেশসেবার কাজে এমন কথা শুনতে হবে তা ভাবেনি। তখন এই লোকগুলোই ইস্কুল বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে ওই খিঁচুড়ি খেয়ে বর্তে গিয়েছিল। এখন গাঁয়ের মাটিতে ফিরে এসে আবার নিজমূর্তি ধরেছে এরা।

আইনুদ্দি বলে—ঘর তো বাঁধবি, তার আগে বাঁধ বাঁধা না হলে এক হড়পায় আবার সব ফৌত।

ওরা তাই বাঁধে এসে হাত লাগিয়েছে। দশ-বিশখানা গ্রামের মানুষ জমেছে এখানে। কেউ তাদের ডাকে নি, শুধু খবর গেছে মাত্র। অবিনাশ-যতিলাল আইনুদ্দিরাও অবাক হয় এত লোকের সমাবেশ দেখে। এই এলাকার সব মানুষ এক নীরব শপথের কাঠিন্য নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে পড়েছে বাঁধে। মাটি কাটছে ঝপাঝপ।

বদন ডাক্তার জগন্নাথপুরে গিয়েছিল, সেখানে আটচালায় মিটিং করতে। গেণু দাসই তাকে আশ্বাস দিয়েছে, এই সব ব্যাপারে গেণু দাসের নাম জাহির করলে এবার পঞ্চায়েত-এর ভোটে বদনকেই দাঁড় করাবে সে। আর বদন ভোটে জিতলে তারপর পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টই হয়ে যাবে। কারণ ওই পদটা গেণু দাসের কৃপাধন্য লোক ছাড়া এযাবৎ কেউ হয়নি।

বদনও স্বপ্ন দেখে, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট থেকে সেই-ই কালক্রমে কেতুলালকে বসিয়ে চাকলার নেতার আসনে কায়েম হয়ে যাবে।

বদন ডাক্তার তাই ওর নড়বড়ে ঘোড়ায় চড়ে এখন গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। সঙ্গে অবশ্য ডাক্তারী ব্যাগটা থাকে। দু'এক পুরিয়া ওষুধও দেয় লোকজনদের সব বিনা পয়সায়।

বদন ওখানেই খবরটা শুনে অবাক হয়। গ্রামে মরদ ব্যাটাছেলে নেই। বুড়োদের কে বলে—ছেলেগুলান তো বাঁধের কাজে গেছে গো। বাঁধ বাঁধছে। তা নাড়িটা একটুন দেখ দিকি! ক'দিন থেকে জ্বর জ্বর করছে, ওই মাইলো সেদ্ধ কি হজম হয় বাবু, তাই গিলছি। শরীরের আর দোষ কি?

…ওর নাড়ি দেখার কথা বদনের মাথায় উঠেছে।

গেণু দাসই বলেছিল বাঁধ বাঁধার সরকারী ঠিকা আসছে, সেটা বদনকেই পাইয়ে দেবে। বদনও হিসাব কষে রেখেছে তার থেকে বেশ কিছু টাকাই সরাতে পারবে সে অনায়াসে।

আজ সেই বাঁধ-এর কাজ সুরু হয়েছে, অথচ গেণুবাবু তাকে এ'কথাটা জানায় নি। আর কাউকে দিয়ে দিয়েছে কাজটা। বদন ডাক্তার তাই এতবড় লোকসানের কথা ভেবে ঘাবড়ে গেছে। কোন রকমে বুড়োর নাড়িটা ছুঁয়ে গোটাদুয়েক পুরিয়া দিয়ে বদন ওই রোদেই ফিরছে বাঁধের দিকে।

রোদও চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। ভিজে বানে ডোবা মাঠের জল-কাদায় টান ধরেছে, বাতাসে ওঠে পচা ধান ঘাসের চিমসে গন্ধ। কাক-চিলগুলো দু'একটা পচা ইঁদুর সাপের গলাপচা দেহগুলো ঠোকরাচ্ছে। বদন ডাক্তারের নড়বড়ে ঘোড়াটা চলেছে ওকে নিয়ে ওই বিবর্ণ মাঠের বুক দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে।

সামনে দেখা যায় কাজলা নদীর বাঁধে ওই লোকদের। বাঁধ বাঁধার কাজ পুরোদমেই চলেছে। ওই রোদের মধ্যে লোকগুলো ওদিকের জমি থেকে কয়েকশো কোদাল দিয়ে রাশি রাশি মাটি তুলে বাঁধে ফেলছে। বাঁশ মরাগাছের গুঁড়ি—ডালপালার খুঁটো পুতে সেই বাঁধের আশপাশ পোক্ত করে ওরা মাটি ফেলছে।

…বদন ডাক্তারকে আজ ওরা দেখেও দেখে না। অবিনাশ-যতিলাল-নকড়ি-রামু মোড়ল-আইনুদ্দি-গোকুল সর্দার আশপাশের গ্রাম থেকে ওরা সবাই এসে হাত লাগিয়েছে বাঁধে! বদন চুপ করে ফিরে এল।

…গেণু দাস কথাটা শুনে অবাক্ হয়।

বদন ডাক্তারের আগেই খবর এনেছে নিতাই-যতীনের দল। এই বানের মরশুমে তারাও বেশ কিছু রোজকার করেছে, আর বাঁধের কাজ শুরু হলে বেশ কিছুদিন ধরে তারা কুলিমেট হতো। টেষ্ট রিলিফের কাজে তারা প্রায়ই এসব কাজ পায় গেণুবাবু, কেতুবাবুদের দযায়। পঞ্চাশটা কুলির নাম যোগাড় করে এ-হাতে ও-হাতে টিপছাপ দিইয়ে তারা বিশজন কুলির টাকা দিয়ে বাকী ভুতুড়ে কুলিদের রোজটা নিজেরাই গায়েব করে এসেছে।

বাঁধের বড় কাজেও এবার কিছু পেতো তারা। কিন্তু হঠাৎ বাঁধে সোরগোল করে কাজ সুরু হতে দেখে ওরাও খবরটা এনেছে গেণু দাসের কাছে। যতীন বলে:

—আজ্ঞে ধূরমার কাজ হচ্ছে দেখলাম বাঁধে! তাহলে বাঁধ বাঁধার ঠিকা কে পেল কত্তাবাবু? আমরা জানলাম না, তলেতলে এতবড় কাজটা অন্য লোকে পেয়ে গেল আপনার দয়ায়?

গেণু দাস জাবদাখাতায় লাভ-লোকসানের হিসাব কষছিল।

ওদের কথায় গেণু দাস অবাক হয়—বাঁধ বাঁধছে! কারা? ওই কাজলা নদীর বাঁধ! এ্যাঁ!

বদন ডাক্তারই গলদঘর্ম হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এবার বিশদভাবে জানায়—ওই দশ-বিশখানা গাঁয়ের মানুষকেই দেখলাম। তারাই বাঁধছে।

গেণু দাস জানে তারা যদি নিজেরাই বাঁধের কাজে হাত লাগায়, সরকার ওদেরই খরচা দেবে। আর গেণু দাস যে দয়া করে বাঁধ বাঁধিয়ে দিয়েছে সরকারকে চাপ দিয়ে এই কথাটাও কেউ বলবে না।

ওই সর্বহারা মানুষগুলোর মনে নিজেদের জন্য কিছু করার মত সাহস মনোবল ফিরে আসবে। সেটা গেণু দাস-কেতুলালের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলেই কঠিন আঘাত হানবে। তাই গেণু দাস কথাটা শুনে রেগে উঠেছে।

তাছাড়া জানে গেণু দাস—ওই বাঁধের আশপাশের চটান জমিগুলো তারই। অবশ্য রেকর্ড পরচায় এককালে ছিল সরকারী খাসমহলের চরভূমি, তারপর গেণু দাসই ওই বিস্তীর্ণ এলাকা জবর-দখল করে বিরাট আখের ক্ষেত তৈরী করেছে। নিজের ট্রাকটার নামিয়ে চাষ দেয়—আর জলের যোগান রয়েছে কাজলা নদীতে বারো মাসই। পাম্প দিয়ে তুলে ওখানে বিরাট ফার্ম করেছে। আর বাদবাকী ডাঙ্গাটা পড়ে আছে এখনও, ওখানেই ফ্যাক্টরী বসাবার জন্য সরকারী টাকাও আসবে। জায়গাটা দখল নেবে সে!

আর গেণু দাস আজ চমকে উঠেছে ওই হতভাগা মানুষগুলোর ঔদ্ধত্যে। ওরা তাকে অগ্রাহ্য করেই নিজেরা এ কাজে হাত দিয়েছে। বাঁধ বাঁধতে লেগে গেছে।

কেতুলালও কলকাতায় গিয়েছিল বাঁধের ব্যাপারেও কথা বলে এসেছে, আর ফ্যাক্টরীর জন্যই গেণু দাসের তাগাদায় গিয়েছিল সেখানে।

কেতুলালকে ফিরতে দেখে গেণু দাস বলে বেশ চড়াস্বরে :

—খবরটা শুনেছো কেতু! বাঁধ বাঁধছে ভূতের দল।

কেতুলালও শুনেছে কথাটা। বদন ডাক্তার বলে ওঠে :

—ওই অবিনাশ-যতিলাল-আইনুদ্দি-রামু মোড়লদেরই দেখলাম। মাতব্বরী করছে বাঁধে!

কেতুলাল কিছু বলার আগে গেণু দাস বলে—পিছনের নেতাদেরও খবর পাওনি বদন? ওই প্রভাতবাবুকে দেখো নি? উনিই তো নাটের গুরু।

প্রভাতবাবুকেও দেখেছে বদন। কিন্তু তার আগেই গেণু দাসের কানে সব খবর এসেছে। গেণু দাস বলে—ওরা বাঁধের মাটি নিচ্ছে

আমাদের জমি থেকে। একবার দেখা দরকার। আমার মাটি আমি দোব না ওদের।

নিতাই-যতীনের দলও তৈরী হয়েছে। গেণু দাসও চলেছে ওখানে সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখতে। দরকার হলে বাধা দেবে সে। তার জমির মাটি দেবে না ওদের।

প্রভাতবাবু ওদের খবরটা জানে। তাকেও বলেছিল অবিনাশ-আইনুদ্দিরা প্রভাতবাবুও খুশী হন ওদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করার কথা ভাবতে। তিনি বলেন—বেশ তো। শুরু করো।

তাদের এই প্রচেষ্টাকে প্রভাতবাবুই সমর্থন করে। তাঁর কথামতই বাঁধটাকে ওরা গড়ে তুলছে। বাঁধের মাথায় নদীর স্রোত এসে ঘা মারে, তাই ওটাকে পোক্ত করা দরকার আর নদীর কোলেও কিছুটা মাটি পাথর দিয়ে ওরা একটা বাধার সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে জলটা ঘা খেয়ে এদিকে পুরো চাপ না দিয়ে ওই পাশের বাঁধে হানা দেবে। প্রভাতবাবুই সেই বুদ্ধিটা দিয়েছে।

…পুরোদমে কাজ চলেছে সেইমত।

হঠাৎ ওরা গেণু দাস-কেতুবাবুকে দলবল নিয়ে আসতে দেখে চাইল, অনেকে একটু ঘাবড়ে যায়। কে জানে—ওদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেছে কিনা।

গেণু দাস অবাক হয়। রামু মোড়ল আইনুদ্দিকে দেখে সে বলে :

—এসব কি করছো রামু? সরকারী বাঁধ নিজেরাই খেয়াল খুশীমত একে গড়বে-ভাঙ্গবে একি কথা?

রামু মোড়ল ছোটখাটো জোতদার। সে বলে ওঠে—কতোদিন হল বাঁধ আর বাঁধছে না কেউ। ভরা বর্ষা সামনে, আবার ডুববো—তাই নিজেরাই জল আটকাবার ব্যবস্থা করছি গেণুবাবু।

আইনুদ্দি বলে ওঠে—নিজেদের জান বাঁচাবার হক্ তো আছে গেণুবাবু? সরকারের বাঁধ সরকার বাঁধবেন, আমরাও হাত লাগিয়েছি, দোষ কোথায়? আর সদরেও খবর পাঠিয়েছি। প্রভাতবাবুই গেছেন।

গেণু দাস চুপ করে শুনছে কথাটা। এই কর্মকাণ্ডের মূলে যে প্রভাতই রয়েছে এটাও জেনেছে সে। কেতুলাল ক্ষুব্ধ হয়ে বলে :

—একটুও সবুর সইল না তোমাদের? ঠিক আছে, তোমরা যা ভালো বোঝো করো।

অবিনাশও এদিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। গেণু দাস বলে ওঠে—তবে বাপু ওই জমি থেকে মাটি নেবে না। অন্য জায়গার মাটি নিয়ে বাঁধে দাও।

অবাক হয় তারা। রামু মোড়ল বলে :

—মাটি তো ওখানেই রয়েছে কাছাকাছি।

ওই জমির মাটি না হলে বাঁধও হবে না। গেণু দাস তা জানে, তাই এবার একপর্দা গলা তুলে বলে সে :

—ওই জমি আমার রামু, তোমরাও জানো। ওখানে আমি কারখানা বসাবার প্ল্যান স্যাংশন করিয়েছি। ও জমির মাটি নিলে আমার সমূহ ক্ষতি হবে। তাই নোটিশ দিয়ে গেলাম। ওখানে মাটি তুলবে না।

এতগুলো মানুষের উদ্যমে ভাঁটা এসেছে। আইনের কথা বলেছে গেণু দাস। প্রভাতবাবুও নেই। এদের সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, আর ওই মারমুখী নদীর সব বন্যা এবার তাদের গ্রাম জমির উপর দিয়ে কায়েমীভাবে বইবে।

গোকুল সর্দার ব্যাকুলভাবে বলে :

—তাহলে কি হবে বড়বাবু? বাঁধ হবে না? আবার ডুববো?

গেণু দাস দেখেছে ওই মানুষগুলোর মুখে বিবর্ণতা, হতাশার ছায়া। মনে মনে খুশী হয়েছে গেণু দাস। সে নিরীহ ভালোমানুষের মত বলে :

—সেটা সরকার বুঝবেন। চলো হে কেতু।

ওরা চরম বাক্য শুনিয়ে এবার চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ অবিনাশ এগিয়ে এসে এবার বলে ওঠে—জায়গাটা আপনার নয় বড়বাবু ওটা হাল কড়চাতেও খাসমহলের জমি বলে লেখা আছে। আপনি বাধা দিলেও শুনবো না।

গেণু দাস চমকে ওঠে অবিনাশের সতেজ কণ্ঠস্বরে। সমবেত হাজারো মানুষও ওই কথাতে একটা আশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

গেণু দাস জানায়—আমার দখলের জমি।

অবিনাশ আজ নোতুন একটি মানুষে পরিণত হয়েছে। জীবনের অনেক কষ্টত্যাগ-আঘাত, ওদের লাঞ্ছনা তাকে এই কঠিন জীবনের একটি অধ্যায়কে সুপরিচিত করে তুলেছে। অবিনাশ ওদের ব্যবহারটা ভোলেনি—সেদিন ওরা তাকে অন্যায়ভাবে মেরেছিল।

কিন্তু বসন্তকেও তারা সেখানে থাকতে দেয় নি। বানের জল কমার মুখেই তাদের সবাইকে সেই আশ্রয়শিবির থেকে বিদায় করেছে। আর টিয়ার মন বিষিয়ে তুলেছে, অবিনাশের বুকের জ্বালাই বেড়েছে সেই শূন্যতার বেদনায়। ওরা সবারই সব কিছু কেড়ে নিতে চায়। আজ এত গ্রামের লোককে নিশ্চিত সর্বনাশের মুখে নদীর বন্যার সামনে ফেলে রেখে গেণু দাসের দল নিজেদের জবরদখল কায়েম রাখতে চায়। অবিনাশ বলে ওঠে:

—জোর করে দখলীস্বত্ব জানাতে চান সব জায়গাতেই? না!

গেণু দাস ওর দিকে চাইল। দুপুরের রোদে অবিনাশ-এর মাটি-মাখা বলিষ্ঠ দেহটা ঘামছে, গেণু দাসের মাথায় রোদ আড়াল দেবার জন্য কে ছাতা ধরে রেখেছে। গেণু দাস রেগে উঠেছে। এত লোকের সামনে অবিনাশ আর ওই কিছু লোক গেণু দাসের প্রতিষ্ঠাকেই চরম আঘাত হানতে চায়। গেণু দাস বলে ওঠে:

—তাহলে জোর করেই দখল করতে চাস তোরা ওই জমি?

রামু মোড়লও এবার পথ পেয়েছে। আজ দশ-বিশখানা গ্রামের মানুষ বাঁচতে চায়, তার জন্য ওই জবরদখলের হাতটাকেও সরাতে চায় তারা। রামু বলে ওঠে—নিজেদের কাজে তো মাটি লাগাইনি বাবু, সরকারের বাঁধে মাটি পড়বে সরকারী জায়গা থেকেই।

—রামু!

গেণু দাস গর্জে ওঠে। অবিনাশও গলা তুলে বলে—ধমকাবেন না বড়বাবু। ও জমি থেকেই মাটি আমরা নোব। জোর করেই নিয়ে বাঁধ বাঁধবো।

যতীন লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে, নিতাইও তৈরী ছিল। বড়বাবুর পোষা লোক তারা, তাদের সামনে বড়বাবুর এত বড় অপমানকে ওরা সহ্য করবে না। যতীন গর্জে ওঠে হাতের লাঠি তুলে :

—তোর মাথাই ছাতু করবো অবা।

নিতাইও হাতের ছড়িটা থেকে ধারালো গুপ্তি বের করেছে। তার আগেই অবিনাশও লাফ দিয়ে ওপাশ থেকে কার হাতের টাঙ্গিটা তুলে নিয়ে গর্জাচ্ছে—এক পা এগোলে তোদের দুটোকেই খতম করে দোব। কোন বাপ বাঁচাতে পারবে না।

চাপা আক্রোশ গুমরে ছিল ওই মানুষগুলোর মনে, ওরা এতদিন নানা কিছু সহ্য করেছে। দেখেছে তাদের দুঃখ-অভাবকে নিয়ে ওরা এতকাল নির্লজ্জ বেসাতিই করেছে আর অত্যাচারই করে এসেছে তাদের সব কিছু লুঠে নিয়ে। আজও এসেছে গেণু দাস তাদের সর্বনাশকে কায়েম করতে। অবিনাশ-রামু মোড়ল ও আইনুদ্দি চাচাকে আজ ওদের অন্যায় লোভের প্রতিবাদ করতে দেখে শেষ করে দিতে চায় ওই গেণু দাসের দল।

কয়েকশো মানুষের নীরব কণ্ঠস্বর আজ গর্জে ওঠে। ওদের কাদামাটি মাখা শীর্ণ হাতের কোদাল-টাঙ্গিগুলো শূন্যে তুলে ওরা গর্জন করে—এক ব্যাটাকেও ছেড়ে দিবি না। ধর সব কটাকে!

…গেণু দাস কেতুলাল এমনি একটা কিছু ঘটবে ভাবতে পারে নি। নিতাই-যতীনের ওই প্রতিবাদ-এর কাঠিন্যকে যে ওরা এমনি করে নস্যাৎ করে জ্বলে উঠবে পুঞ্জীভূত আগুনের মত তা ভাবে নি। ওই বিশাল জনতা আজ গর্জে ওঠে।

…তাদের প্রতিরোধের সামনে এরা বিচলিত হয়ে পড়েছে।

গেণু দাস চতুর ব্যক্তি। সে উল্টে নিতাই-এর গালে একটা চড় মেরে শাসায়—তোকে কে আসতে বলেছে এখানে!

যতীন তখনও গর্জাচ্ছে।··হয়তো দু-চারটে আঘাতেই ছিটকে পড়বে সে। আর একবার ওদের মারামারির নেশা এসে গেলে, গেণু দাস-কেতুলালও রেহাই পাবে না।

···এমন সময় দেখা যায় নদীর ওদিকে দুটো জিপ এসে থেমেছে। প্রভাতবাবুর সঙ্গে এসে হাজির হয়েছেন সেচ দপ্তরের পদস্থ কর্মচারী, বাঁধের ব্যাপারেও তাঁরা অন্য কাকে নিয়ে এসেছেন। বাইরের সাহেবদের সঙ্গে প্রভাতবাবুকে দেখে এদিকের জনতা একটু শান্ত হয়।

যতীন-নিতাইও এমনি সুযোগ বুঝে এবার ওরাও সরে গেছে। যতীন নিতাই ভাবতে পারে নি যে কর্তাদের সামনেই ওই মানুষগুলো এমনিভাবে আক্রমণ করবে তাদেরই। ওরা বেগতিক দেখে সরে পড়েছে। কেতুলালও কি ভেবে হঠাৎ ভোল বদলে সে কর্মব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে—এ্যাই। আরে থামো তোমরা। এসবের মীমাংসা একটা আলোচনার মধ্যেই হবে। কেন মাথা গরম করছো খামোকাই। সব হবে।

···সাহেবরা নদীর খেয়া পার হয়ে ভাঙ্গা বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছেন। গেণু দাস গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ হঠাৎ সে দেখছে এতদিন ধরে যে ধারণা করেছিল, যে হিসাবে চলেছিল, সেই হিসাবটা কোথায় সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। ওই ক্ষুব্ধ জনতাকে সে বশ করতে পারে নি। ওদের মনের অগ্নিজ্বালাকে সে আজ প্রত্যক্ষ করেছে। হয়তো তাকে চরম আঘাতই করতো ওই লোকগুলো আর একটু হলে।

গেণু দাস মনের জ্বালাটা চেপে রয়েছে। এ সময় তার মাথা গরম করা সাজে না। গেণু দাস জানে কখন কিভাবে চরম আঘাত হানতে হয়। তাই এখনকার মত সে এত বড় ব্যাপারটাকে সহজ-ভাবেই নিয়ে বলে :

—রামু মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো। অবিনাশ জোয়ান মরদ, তার রক্ত গরম হতে পারে। কিন্তু আইনুদ্দি, তুমি তো বুড়ো হয়েছো, এখনও মাথা গরম করবে ?

প্রভাতবাবুও এসে পড়েছে। গেণু দাস বলে, পরম দরদীর মত।

—ভালোই করেছো মাস্টার ওঁদের এনে। কাজটা সুরু করা দরকার প্ল্যানমাফিক। দেরী হয়ে যাচ্ছে, সামনে বর্ষা।

কেতুলাল স্থানীয় নেতা, তাই ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকেরা ওর সঙ্গেই কথা বলে বাঁধের এদিক-ওদিকে ঘুরে ম্যাপ দেখে একটা প্ল্যান ছকছেন।

আবার বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। আইনুদ্দিও অবিনাশকে থামিয়েছে। অবিনাশ বলে :

—মারামারি করতে তো চাই নি চাচা। ওরাই বলে ও জমি থেকে মাটি দেব না। বাঁধ করতে না দেবার তালেই ছিল ওরা। তাই রুখে দাঁড়াতেই ওই ব্যাটারাই ক্যাঁচা বের করলো।

আইনুদ্দি বলে—ছাড়ান দে ওসব কথা। এখন তো চুপচাপ করে রাজী হয়েছে।

অবিনাশ গর্জায়—রাজী হয়েছে? নাহলে ওদের ঘাড়কে রাজী করাতাম চাচা।

অবিনাশ আবার মাথায় পগ্‌গ বেঁধে মজুরদের মাঝে চীৎকার করছে।

—মাটি ফেল। জোরসে মরদ। এ্যাই ফটিক মাংগনার কাজ এ করছিস না, পুরো রোজের কাজ। হাত চালা।

সরকার থেকেই এবার কাজের ভার নিয়েছে। কোন ঠিকাদারের ব্যাপারও নেই। সময় অভাবে কাজ সরকার পক্ষ থেকেই করানো হচ্ছে। আর তরুণ ইঞ্জিনীয়ার রমেশবাবুও খুশী হয়েছেন এদের কাজের পরিমাণ দেখে।

অবিনাশ বলে—আপনি শুধু দেখে যান স্যার, ঠিক ঠিক কাজ হচ্ছে কিনা। মাটি চুরির ব্যাপার এখানে হবেক নাই। ওরা এতেই খুশী।

দিনে নগদ টাকা আর চালের হিসাবে মজুরী নিতে হচ্ছে দেখতে দেখতে নদীর সেই উদ্যত হাঁ করা হিংস্র হানামুখকে ওর

পাহাড় প্রমাণ করে বুজিয়ে আনছে। যাতে বন্যার হিংস্র হানা আর তাদের গৃহহারা, সর্বহারা না করতে পারে।

অবিনাশ ক'দিন ধরে ওই বাঁধেই পড়ে আছে। বর্ষার তোড়জোড় সুরু হয়েছে। বীজধানও এসেছে ব্লক অফিস থেকে। তারই ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা আছে।

রামু মোড়ল-যতিলাল এরাই বলে :

—তুই এগিয়ে আয় অবিনাশ। বাঁধ তো সারা হল। এবার অন্যদিকে নজর দিতে হবে। বানে আবার কি গোলমাল বাধাবে ওরা ?

…ক'টা দিন ঝড়ের মত কেটে গেছে। কিন্তু গভীরভাবে দাগটা বসেছে গেণু দাসের মনে। কেতুলালও দেখেছে এতকাল সব কাজে তাদের হাতটাই এগিয়ে গেছে সর্বত্র। এবার যেন তার রূপ বদলেছে।

বাঁধ বাঁধার এতবড় ব্যাপারটা নিয়ে একটা হিসাব করে রেখেছিল গেণু দাস, সেই হিসাব পুরো গোলমাল হয়ে গেছে। সরকার থেকেই ওই কয়েক হাজার টাকার কাজ করানো হয়েছে, কাজটা করেছে ওই অবিনাশ-রামু মোড়লের দল। আর তারাও যে এত বড় কাজ অনায়াসেই করতে পারে সেইটাই দেখিয়েছে। কাজলা নদীর বান এখন আর নেই, ওদিকে বেশ কিছু জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে গেণু দাসের। বরং এবার গ্রামসভার সকলে দাবী জানিয়েছে ওই সমস্ত চরটার। দুশো বিঘের দখল এবার যেন গেণু দাসের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চাষের বীজধান-সার-এর বিলি-ব্যবস্থার ভার পড়ে নি তাদের উপর। সেটার এখন ভার পড়েছে বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরদের উপর। তারাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের বিলি করছে। অপচয়ও হয় নি। ঠিকমত হিসাবও দাখিল করেছে তারা।

… বদন ডাক্তারও হতাশ হয়েছে। এবার তার সামান্য ডাক্তারী ব্যবসাতেও মন্দা পড়েছে। সেদিন নশীপুরের হাটে ওই গোকুল

সর্দারই বলে—আর চামচাগিরি করে কি হবে ডাক্তার, ডাক্তারীই করো। এবার হাওয়া দেখছো না? ভোট এলে তখন সব উলটে না যায়।

বদন ডাক্তার অবশ্য সাবধানী ব্যক্তি। ও বলে ওঠে:

—আমার কি বাবা! তোদের বিপদের সময় একটু দেখভাল করলাম, ব্যস, চুকে গেল ল্যাঠা। তা তোর ছেলের জ্বর কমেছে?

গোকুল সর্দার বলে—রামপুরের ডাক্তারখানাতেই দেখাচ্ছি বাবু।

বদন ডাক্তার জবাব দিল না। তবে মনে হয় এই জবাবে সে খুশী হয়নি। বদন ডাক্তারও খবরগুলো গেণু দাসের কানে তোলে—ওরা এখন সাবালক হয়ে গেছে বড়বাবু।

গেণু দাস কথা ব'লে না। ভাবছে সে, এবার তাকে দাবার ঘুঁটিগুলো একটু হিসাব করেই চালতে হবে।

প্রভাতবাবু অবিনাশরাই আজ তার প্রতিপক্ষ। কটা মানুষই ওই হাজারো মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, ওদের মনের অতলের কর্মস্পৃহা, একটা সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলছে।

কোথায় কিভাবে আঘাত হানতে হবে সেটাই ভাবছে গেণু দাস।

কেতুলাল বলে—সদরের রিলিফ অফিসারের স্বার্থেই এসব হচ্ছে গেণুবাবু। লোকটা কাজের নাম করে যতো অকাজ করছে। কেতুলালের কথায় গেণু দাস কি ভাবছে। হঠাৎ বলে ওঠে:

—ওকেই বদলি করা যায় না? মানে—একটা কিছু খাড়া করে।

কেতুলালও ভাবছে কথাটা। নিতাই-যতীন-বদন ডাক্তারের দল আছে, আছে অধরবাবুর মত স্বার্থপর মধ্যবিত্ত মনের দুর্বলচেতা কিছু লোক। এরাই গেণু দাসদের দাবার ঘুঁটি।

কেতুলাল বলে—চেষ্টা করতে হবে।

গেণু দাস জানায়—তাই করো।··ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গেলে বিপদ ঘটে, সেটা জানানো দরকার।

গেণু দাসের রাগটা বেড়ে গেছে। দেখেছে এত বিপদেও এ চাকলার কোন মানুষ তার কাছে সাহায্যের জন্য আসে নি।

পাশাপাশি বাসা দুটো। মাঝখানে কয়েকটা আম-কাঁঠাল গাছের ভিড়। টিয়া দিদিমণির বাসা থেকেই দেখেছে প্রভাতবাবুর সংসারের ছবিটাকে, সবিতাও চেনে প্রভাতকে। তরুণ ছেলেটি দিনরাত নানা কাজে ব্যস্ত। সদরে দৌড়চ্ছে, তারই চেষ্টায় ওই বাঁধ-এর কাজ হয়েছে, গ্রামের মানুষ বীজধান-সার, কিছু অর্থ সাহায্য, কৃষিঋণ পেয়েছে—যাতে মহাজনের কাছে তাদের জমি-জায়গা বেচতে না হয়।

সবিতা বলে—এত খাটুনি খেটে লাভ কি প্রভাতবাবু?

—লাভ! প্রভাত এর জবাব জানে না। বলে সে:

—ওই মানুষগুলোর মাঝে অনেক প্রাণশক্তি, অনেক সৎবৃত্তি রয়ে গেছে। ওদের কোন সৎকাজে যদি লাগতে পারি, তাই এগিয়ে যাই।

সবিতার বারান্দায় বোগেনভিলা গাছের রঙিন পাতাগুলো বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ছুটির দিন—তাই চা খাবার অবসর মেলে। টিয়া চা এনেছে। প্রভাত ওর দিকে চাইল—তুমি! এখানে?

সবিতা বলে—এখানে আমার কাছেই রয়েছে। কাজের মেয়ে।

টিয়া বলে ওঠে—দিনরাত ওদের জন্য খেটে কি পান?

প্রভাত জবাব দিল না। হাসল মাত্র। হঠাৎ মনে পড়ে যায় কোন গ্রামের কথা! প্রভাত বলে—আজ উঠি। বেরুতে হবে।

ঝড়ের মত বের হয়ে যায় সাইকেল দাবড়ে ওই বৃষ্টি-রোদের মধ্যেই।

টিয়া বলে—সারা এলাকার মানুষ ওকে ভালবাসে দিদি।

সবিতা বলে—ছাই। নিজের গতরপাত করছে। খাবার ঠিক নেই, ফেরার ঠিক নেই। কি যেন নেশায় ঘুরছে ওরা।

টিয়া তবু দেখেছে ওই মানুষটাকে। এই অঞ্চলের গরীবের বন্ধু, ওই মানুষগুলোর জন্য বুকভরা দরদ ওর। হঠাৎ কেন জানে না, টিয়ার অবিনাশকে মনে পড়ে।

…দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছুটির দিন খাওয়া-দাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রা দেওয়া সবিতার অভ্যাস। টিয়ার খেতে দেরী হয়ে গেছে, কাচাকাচির কাজ রয়েছে।

ওসব চুকিয়ে স্নান করে এসেছে, হঠাৎ দেখে ওদিকের বন্ধ বাসায় ফিরে এসেছে প্রভাত। সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায়।

প্রভাতের এমন প্রায়ই হয়। নাইবার খাবার সময় নেই, কোথায় কোন্ গ্রামে আটকে গেছলো। তাই দুপুরে ঘরে কিছু থাকলে তাই দিয়েই 'লাঞ্চ' সারতে হয়, নইলে কুঁজোর জল খেয়েই কাটিয়ে দেয় সে।

আজ বোধহয় প্রভাতের তেমনিভাবেই দিন কাটাতে হবে। স্নান সেরে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়েছে, এমন সময় টিয়াকে ঢুকতে দেখে চাইল প্রভাত। অবাক হয় সে।

—তুমি!

টিয়ার হাতে টিফিন-কেরিয়ারে ভাত-ডাল-তরকারী। ওগুলো নামিয়ে দিয়ে টিয়া বলে:

—প্রায়ই তো দেখি জল খেয়ে, না হয় চিড়ে-মুড়ি চিবিয়ে দিন-রাত কাটান, বিদেশে শরীর খারাপ হলে কে দেখবে?

প্রভাত অবাক হয়েছে, তাই বলে—এসব এনেছ?

টিয়া একটা প্লেটে খাবারটা সাজিয়ে দিয়ে বলে—দিয়ে গেলাম; খেয়ে নিন।

টিয়া দাঁড়ায় নি। বের হয়ে এসেছে।

ছায়াঘন বাগানে দুপুরের মেঘভাঙ্গা রোদ কি ঔজ্জ্বল্য এনেছে। টিয়ার মনে পড়ে অবিনাশের কথা। ওরা যেন সকলেই এমনিই। একই সুরে বাঁধা।…এমনি করে তিলে তিলে ওরা নিজেদের শেষ করে। ওদের আপনজন কেউ নেই—তাদের কথাও ভাববার প্রয়োজন নেই। এমন কি নিজেদের কথাও ওরা ভাবে না।

ওর খবরটা তবু প্রভাতের মুখেই শোনে টিয়া।

অবিনাশ এখন ওই এলাকার পরিচিত নাম। সবিতাও দেখেছে লোকটাকে।

প্রভাতবাবু মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় এসে হাজির হয়। গ্রামের বাইরে এই আমবাগানের এলাকাটায় সন্ধ্যার পর নির্জনতা নামে। ছোট্ট বাড়ি ক'খানার বাসিন্দাদের নিয়ে এই ছোট ছায়া অন্ধকার মত জগৎটা যেন নিজস্ব রীতিতে চলে। ওদিকে বোর্ডিং-এর আলোগুলো জ্বলে ওঠে, ছেলে-মেয়েদের পড়ার শব্দ থেমে আসে। রাত্রি ভরে ওঠে ঝিঁঝি পোঁকার একটানা শব্দে।

সবিতাই বলে প্রভাতকে—স্কুলেও তোমার সম্বন্ধে নাকি কথা উঠছে। তুমি নাকি ঠিকমত ক্লাশ নাও না—স্কুলেও যাও না মাঝে মাঝে।

প্রভাতও শুনেছে এসব কথা। জানে সে এসব কথা ওঠার কারণগুলো। আজ সে ওই সাধারণ মানুষদের হয়ে কাজ করেছে। তাদের গেণু দাসের শক্ত ধারালো থাবার শিকার হতে দিতে চায়নি। সরকারী সাহায্য – ঋণ-অনুদান সব কিছুর সদ্ব্যবহার করেছে। তাই গেণু দাস-কেতুলালের দল তাদের শিকার হাতছাড়া হতে দেখে গর্জে উঠেছে। তার উপরই আঘাত করতে চায়।

প্রভাত বলে—ছুটি যা পাওনা তার থেকেই নিইছি সবিতাদি, আর তুমি তো জানো, আমার চেয়ে অনেক মাস্টার মশাইরা ক্লাশ বেশী কামাই করেন।

সবিতা ওই আপনভোলা ছেলেটিকে ছোট ভাই-এর মতই দেখে। তাই ওকে বলে—বিদেশে এসে ওদের সঙ্গে শত্রুতা না-ই বা করলে প্রভাত।

প্রভাত জবাব দেয় না। চুপ করে কি ভাবছে।

টিয়া চা দিতে এসেছিল। ও বলে ওঠে—ওঁদের বীরত্বটা একটু বেশী দিদি। তার জন্য আর যে কেউ যতই দুঃখ-কষ্ট পাক, ভাবুক, ওদের কিছুই আসে যায় না। কারোও কথা ভাবে না তারা।

প্রভাত শুনছে ওর কথাগুলো।

টিয়ার মনের অতলের জ্বালাটার খবর জানে সবিতাও। মেয়েটা যেন মুখ বুজে অনেক কিছুই সহ্য করেছে। করছেও। চা নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে টিয়া। সবিতা বলে ওঠে :

—টিয়ার স্বামী, তোমার ওই অবিনাশও সত্যি বিচিত্র! লোকটা একবার খবরও নিতে এল না—এত কাজ ওর? একবার ডেকে আনতে পারো তাকে প্রভাত?

প্রভাত জানে ব্যাপারটা। কিন্তু টিয়াকে সে চিনেছে। তাই বলে :

—আনবো। কিন্তু আমার যে ডান হাত অচল হয়ে যাবে টিয়াও বাড়িতে গেলে।

সবিতা বলে—তাই বলে এমনি জ্বালা নিয়ে মরবে মেয়েটা? ওর কি দোষ?

প্রভাত এর জবাব দিতে পারে না। টিয়ার জন্য দুঃখই বোধ করে। এ নিয়ে অবিনাশকে সেই-ই কথা বলবে।

খাওয়ার ব্যাপারটাও মাঝে মাঝে প্রভাতের এখানেই সারতে হয়। টিয়াও সেটা জানে। তাই রাত্রে রুটি কিছু বেশীই করে। আজও করেছে। খাবার জায়গা করে সে ডাক দেয় প্রভাতকে বাইরে থেকে।

—খেয়ে নেবেন চলুন!

প্রভাত উঠছে। টিয়াই বলে—আর রাতে আপনার বাসায় খাবার বইতে পারবো না। এখানেই খেয়ে নিন।

সবিতা হেসে ওঠে। প্রভাত অপ্রস্তুতের মত বলে—রাতে মুড়ি-গুড়—দুধ রয়েছে।

টিয়া জানায়—দুধ বেড়ালে খেয়ে গেছে, শুধু মুড়ি চিবিয়ে কেন থাকবেন? চলুন।

...টিয়ার কাছে এখানের জীবনটাও কেমন একঘেয়ে বোধহয়। কানে আসে সব কথাই। নদীর বাঁধে সেবার এরা অবিনাশকে মারতে গিয়েছিল, তাও শুনেছে। দেখেছে ওদের সমবেত চেষ্টায়

আবার মরা মাঠে এসেছে সবুজ ধানের ইশারা। সেই বুভুক্ষু মানুষ-গুলো আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। অবিনাশ সেই ঋজু সোজা মানুষগুলোর একজন।

আর টিয়া সেই কঠোর জীবন থেকে নিজে সরে এসেছে, তার মনগড়া কিছু যুক্তি দিয়ে, সে এই স্বার্থপরতাকে ঢাকার চেষ্টা করেছে। আজ মনে হয় ওই মানুষটার উপর অবিচারই করেছে টিয়া।

গ্রামের বাইরে আমবাগানে হাট বসে। সপ্তাহে দু'দিন হাট। আমবাগানের ফাঁকায় চালাঘরে কিছু কাপড়-জামা, মনোহারীর মাল নিয়ে ফিরিওয়ালারা আসে আব কিছু তরিতরকারীও আসে।

বর্ষার সময়—চাষীদের অনেকেই মাঠে ব্যস্ত। তাই তরিতরকারীর আমদানী কম। তবু টিয়াকে আসতে হয় হাটে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। জিনিসপত্র নিয়ে ফিরছে টিয়া—এক পশলা বৃষ্টিও এসেছে, হঠাৎ কাঁঠালগাছের নীচে যতীনকে দেখে চাইল। হাটের দিন ওদের ব্যবসাটাও বেশ ভালোই চলে। নিতাই-যতীনদের চোরা ভাঁটির মদও প্রচুর বিক্রি হয়। আর নিজেরাও বেশ গিলে তৈরী হয় শেষকালে।

ওই দুটো জানোয়ার যেন এই শান্ত পরিবেশে কি হিংস্র আদিম লালসা নিয়ে ফেরে। মেয়েরাও প্রতিবাদ করেছে—তেমন কোন ফল হয়নি।

যতীন টিয়াকে বৃষ্টির মধ্যে নির্জন পথে দেখে এগিয়ে যায়। মেয়েটার উপর তার নজর রয়েছে কিছুদিন থেকেই। তবু বাবুদের জিয়োন মাছ-এর মত আগলে ছিল, আজ যতীন সাহসে ভর করে এগিয়ে আসে। বলে সে:

—বৃষ্টিতে ভিজে চলেছো টিয়া! মাইরী—যা সোন্দর লাগছে তোমাকে। গুপী বোষ্টমের গানের মতন—চলে লীল শাড়ি—

টিয়া ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। এই জানোয়ারগুলোকে এখানে দেখেছে সে। এরা অবিনাশের উপর সেই স্কুলের মাঠে চড়াও হয়েছিল, বাঁধের গোলমালে সেদিন গুপ্তি চালাতে গিয়েছিল

তার উপর। আজ এসেছে টিয়ার সামনে একটা মাতাল জানোয়ারের মত আদিম লালসা নিয়ে।

টিয়া বলে ওঠে—পথ ছাড়ো।

যতীন টলছে। চোখে তার গোলাপী নেশার আমেজ। যতীন বলে ওঠে :

—ওই অবাকে ছেড়ে এসে ভালোই করছো। শ্লা—ফুকো কাপ্তান! লীডর! অমন লীডর দু-চারটে ট্যাঁকে গুঁজতে পারি। আমার শ্লা ট্যাকার অভাব? দিন—দশ বোতল, মানে পঞ্চাশ ট্যাকা রোজকার।

টিয়া ওকে এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি চলেছে, হঠাৎ যতীন ওর হাতটাই ধরেছে।

টিয়াও এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওর গালে সপাটে একটা চড় কষাতে ভিজে পিছল মাটিতে ওর টলটলায়মান দেহটা ছিটকে পড়েছে। টিয়াও এই অবকাশে দৌড় দেয়। দৌড়চ্ছে মেয়েটা, কি আতঙ্ক নিয়ে!

বাসার কাছে এসে হাঁপাচ্ছে। তরকারীর ঝুলিটা নামাতে দেখে সবিতা বলে—হাঁপাচ্ছিস কেন?

টিয়া প্রসঙ্গটা চেপে গিয়ে জানায়—আচমকা বৃষ্টি নামলো, তাই দৌড় লাগালাম কিনা—

আসল কথাটা বলতে লজ্জা করে ঘৃণা করে টিয়ার।

...গেণু দাস এর মধ্যে পথ করে নিয়েছে। কেতুলাল কলকাতা থেকে খবর এনেছে—জমি জায়গার নোতুন রেকর্ড পরচা তৈরী সুরু হবে এইবার ফসল উঠলেই, গেণু দাসও তাই তৈরী হয়েছে।

সেদিন স্কুলের মিটিং-এ ব্যাপারটা নিয়ে সোরগোল ওঠে।

বদন ডাক্তারও কমিটির মেম্বার। বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণেরও একজন। অধরবাবু হেডমাস্টার, তিনিও কমিটিতে আছেন। বদন ডাক্তার, তিনকড়ি রায় দু'জনেই কথাটা তোলে। ওদের কথায় গেণুবাবুও চুপ করে থাকে।

—প্রভাতবাবুর ছুটি অনেক আর ক্লাশও বেশী নেন না। তাছাড়া শিক্ষক হবেন আদর্শ চরিত্রের। প্রভাতবাবুর চরিত্র সম্বন্ধেই এবার প্রশ্ন উঠেছে। এটার বিহিত হওয়া দরকার।

গেণুবাবু চেয়ারম্যান। সে নিপাট ভালোমানুষের মত বলে—এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বদনবাবু, এ সম্বন্ধে সাক্ষী প্রমাণ না থাকলে এসব কথা মিটিং-এ না তোলাই সঙ্গত বদনবাবু।

বদন ডাক্তার জোর গলায় জাহির করে—সাক্ষ্য-প্রমাণ সবই আছে বড়বাবু। ওই মেয়েদের স্কুলের নোতুন দিদিমণি—ওর পাশের বাসাতেই থাকেন, ওখানেই তো বৃন্দাবন গড়ে উঠেছে, রাসলীলা চলছে। আজ্ঞে আমি কেন—ওদিগরের সবাই জানে। শুধোন্ ওদের!

সাক্ষ্য দেবার লোকের অভাবও হয় না।

যতীনও এগিয়ে আসে। ক্ষুদিরাম গোয়ালা বদনের হাতের লোক। সে ওইদিকে দুধের রোজ দিতে যায়, সেও দেখেছে অনেক কিছু। অবিনাশের তাজা বৌটাও প্রভাত মাস্টারের ঘরের কাজ করে, খাবার করে দেয় নিজের হাতের কাজ ফেলে—এসব গূঢ় তথ্যও ওই প্রকাশ্য সভায় ঘোষিত হয়।

ভিড় জমে গেছে বাইরে। বেশ কিছু লোকও জুটেছে ওই আলোচনা শুনতে।

স্কুলের শিক্ষকরাও কেউ মন্তব্য করে:

—এসব কাণ্ড চলছিল, টেরও পাইনি আমরা। সত্যিই অন্যায়।

গেণু দাস আজ বিচারকের আসনে সমাসীন। গেণু দাসই বলে:

—তাহলে ওদেরও ডাকা হোক। ওদের বক্তব্যটাও শোনা দরকার। অধরবাবু আপনি ওদের দু'জনকেই ডাকাবার ব্যবস্থা করুন।

অধরবাবু প্রথমে বদন ডাক্তারের কথাটা শুনে অবাক হয়। এমন কোন ঘটনা তার জানা নেই। প্রভাত ছেলে হিসাবে ভালোই, সবিতাদেবীকে সে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আর ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার সম্বন্ধে সবিতাদেবীর কিছুটা স্নেহ রয়েছে এটাই জানতো সে।

অধর ভটচায এতবড় মিথ্যা অপবাদটাকে মেনে নিতে পারে নি। ও বলে ওঠে—এসব কথার গুরুত্ব দেবেন না বড়বাবু। প্রভাতবাবু ওঁকে দিদি বলে ডাকেন, মান-সম্মান করেন—আর টিয়াও ভালো মেয়ে।

গেণু দাস একটু চমকে ওঠে। তার সাজানো ঘুঁটিগুলোই যেন বিদ্রোহ করে তার চাল বেচাল করে দিতে চায়। গেণু দাসের মুখ-চোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে অধরবাবুর এই ব্যবহারে।

সেটা জানাতে চায় না গেণু দাস। তাই বলে ঃ

—কথাটা সত্যি না মিথ্যা এসব বলতে চাই না, আমি শুধু জানতে চাই প্রভাতবাবুর মুখ থেকেই এসব সত্যি না মিথ্যা। সত্যি না হয় ব্যস চুকে গেল ল্যাঠা।

আর ওই সবিতা দিদিমণিও বলবেন—কি ব্যাপার!

বদন ডাক্তারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবার তিনকড়ি রায় আর শিক্ষক প্রতিনিধি দেবেশবাবুও। তিনি বলেন ঃ

—প্রশ্ন যখন উঠেছে তার জবাব দিতেই হবে কমিটির সামনে ওদের দু'জনকেই, ডাকা হোক ওদের দু'জনকে।

…খবরটা শুনে লজ্জায় অপমানে নীল হয়ে ওঠে সবিতা।…টিয়া ওঘরে কি কাজ করছিল, সেও ছুটে আসে।

—সবিতাদি!

সবিতা দু' হাতে মুখ ঢেকে কি যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। টিয়া দেখেছে প্রভাতবাবুকেও হন্তদন্ত হয়ে বাসা থেকে বের হয়ে আসতে। রবিবারের দুপুরে ওরা আজ বিশ্রাম করছিল, হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেছে ওই স্কুল বাড়িতে, সেই নোংরা মিথ্যার ঢেউটা বাতাসে ছড়িয়ে এখানে আসতে দেরী হয় না।

প্রভাতবাবুই এগিয়ে আসে—ওদের নোংরা কথাগুলো শুনেছেন দিদি? অসভ্য ইতরের দল এতবড় অপমান করতে সাহস করে আপনাকে? আমার সম্বন্ধে যা খুশী বলুক, তাতে আমার যায়-আসে না, কিন্তু ছিঃ ছিঃ, এত বড় জঘন্য মিথ্যাটা ওরা বলতে সাহস করে?

সবিতাও নিজেকে সামলে নিয়েছে।

আজ তার স্বামীর কথাগুলো মনে পড়ে। দুর্গাপুরে পদস্থ অফিসার তিনি, সুন্দর বাংলো—বেয়ারা সবই রয়েছে।

উনিই বলেন—চাকরির দরকার কি তোমার সবিতা?

সবিতাও এইবার চাকরি ছেড়ে দেবার কথাই ভাবছিল। কিন্তু এমনি বিশ্রী কথা শুনতে হবে, তা ভাবে নি।

সবিতা বলে—আমার জবাবটা আমি লিখে পাঠাচ্ছি প্রভাত। টিয়াই দিয়ে আসবে ওদের কমিটির সামনে চিঠিখানা।

প্রভাত চমকে ওঠে—রেজিগ.নেশন লেটার!

সবিতা হাসে—এই নোংরা চক্রান্তের মাঝে আর একদিনও থাকতে চাই না প্রভাত। স্কুলের প্রকাশ্য সভায় যারা এমনি জঘন্য মিথ্যার পশরা সাজাতে পারে—তারা শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু নোংরাই আনবে, তাই এখান থেকে চলে যাচ্ছি প্রভাত।

প্রভাত কঠিন স্বরে বলে—কোন প্রতিবাদই করবেন না?

সবিতা বলে—জ্ঞানহীনদের সামনে প্রতিবাদও অর্থহীন প্রভাত। তাই ঘৃণাভরে সরে যাওয়াই ভালো বুঝেছি।

টিয়াও শুনেছে সব কথা। প্রভাতবাবুর মত মানুষকেও ওরা কাদা মাখিয়েছে! আরও দুঃখ হয় দিদিমণিকেও তারা বাদ দেয় নি। ওই গেণুবাবুর দল। বদন ডাক্তারই নাকি কথাটা তুলেছে ওই মিটিং-এ।

টিয়া বলে—ওসব ওই গেণু দাসেরই কারসাজি, বদন-তিনকড়ি ওরই চামচে। আমি ওই পাপগুলানকে চিনি দাদাবাবু।

প্রভাতও মনস্থির করে ফেলেছে। ওই শয়তানের দরবারে সে হাজির হয়ে কোন কৈফিয়তই দেবে না। ওদের সে আজ ঘৃণা করে। এর জবাবই দেবে সে একইভাবে।

গেণু দাস তখনও অপেক্ষা করছে। বাইরে বেশ কিছু কৌতূহলী শিক্ষক—লোকজনও রয়েছে। ভিতরে মিটিং চলেছে পুরোদমে। আজ এমন সরস ব্যাপারটাকে ওরা যেন অনেকেই উপভোগ করছে। এমন সময় টিয়াকে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা।

টিয়া চিঠিখানা গেণু দাসের সামনে দিয়ে বলে :

—দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন।

গেণু দাস চিঠিখানা খুলে ইংরেজী লেখা দেখে একটু ঘাবড়ে যায়। ওটা বিশেষ তার আসে না। বদন ডাক্তারের বিদ্যেও তেমনিই ক্ষুরধার—তাই অধরবাবুর হাতেই চিঠিটা দিয়ে বলে :

—পড়ো অধর!

অধরবাবু জানতো, এর জবাব এমনিই একটা হবে।

প্রভাতবাবুও সেই জবাবই দিয়েছে, অবশ্য প্রভাতবাবুর জন্য তাদের রীতিমত ভয় রয়ে গেছে। কারণ ইস্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ড, ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড-এর টাকার গোলমালের খবর সে জানে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে সব টাকা জমা পড়ে নি, সেটাও জেনেছে সে। প্রভাতবাবু পদত্যাগপত্রের সঙ্গে তার প্রাপ্য টাকার দাবী জানিয়েছে।

টিয়া বড়বাবু-বদনবাবুর বিদ্যের বহর দেখে বলে ওঠে :

—আপনিই পড়ুন কেন গেণুবাবু? তা নিজের বিদ্যে তো এই—আপনার চেয়ে বেশী বিদ্যের লোকের সম্বন্ধে তাহলে যা-তা বলেন কেনে গো?

গেণু দাস ওর দিকে চাইল।

বদন ডাক্তার ধমকে ওঠে—থামবি তুই?

টিয়া হাল্কা স্বরে বলে ওঠে—দুটো প্রাণের কথা বলতে দাও গোবদ্যি মশায়। ঝড়ের রাতে বিদ্যুতের আলোয় বড়বাবুর চোখের লিশাটাও দেখেছি—তার জন্যেই তখন পাকা কোঠায় ঠাঁই দিলে, চাকরিও দিতে চেয়েছিলে। তা আমি তো লষ্টাই গো তোমাদের চোখে, আমাকে জড়িয়ে প্রভাত মাস্টারের নামে দু'কথা বললে লোকে মানতো। কাজও হতো—তা লয়, দিদিমণির মত মেয়ের নামে যা তা বলতে এতটুকু বাধলো না তোমাদের? জিবে আটকালো না? ছিঃ ছিঃ!

গেণু দাস চমকে উঠেছে মেয়েটার কথায়। ওর গতরের নেশাটা

তার মিথ্যে নয়, আর প্রকাশ্য সভায় ওই টিয়া এসেছে সেই কথাটা জানাতে। টিয়া ওদিকে যতীনকে দেখে বলে ওঠে :

— চোলাই মদ বিচে বড়বাবুর দলে উঠেছিস বুঝি ? তবে জেনে-শুনে বড়বাবুর মেয়েছেলের দিকে সেদিন লজর দিইছিলি কেনে রে সাঝবেলায় !

যতীন কাঁচুমাচু করছে। মেয়েটার জিবের ধার ওর রূপের মতই ঝকমকে।

বদন ডাক্তার ধমকে ওঠে—স্কুলের মিটিং চলছে। থাম তুই টিয়া।

টিয়া বলে ওঠে—তাই নাকি গো ! আমি তো ভাবছিলাম পতিত করার সভা ডেকেছো। তাহলে যাই, আর যতীন সেদিনের চড়টা জোরে লাগে নি তো রে। আহা— চ'লি গো বড়বাবু !

গেণু দাস-এর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে। রাগে অপমানে ও কাঠ হয়ে গেছে।

অধরবাবুর কথাগুলো ঠিকমত যেন শুনতে পায় না। ওর মনের সেই বিজয়ীর তৃপ্তিটুকুও মুছে গেছে। অধরবাবু বলে :

—ওঁরা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, তাই কোন কৈফিয়ত দিতে রাজী নন।

বদন ডাক্তার বিজয়ীর মত চীৎকার করে ওঠে—আর কি বলবার আছে ?···ওসব দুষ্ট গরুর দলকে দূর করুন মাস্টার মশাই। স্কুল হচ্ছে শিক্ষা মন্দির। মন্দিরের পবিত্রতা এখানে দরকার।

গেণু দাস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে :

—ওসব কথা থাক বদন। তাহলে আজকের মত মিটিং শেষ হয়ে গেল।

গেণু দাস জানে এই রসাল খবরগুলো এর মধ্যে ডালপালা গজিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর অবিনাশের রঙ্গিনী বৌটা প্রকাশ্য মিটি-এ এসে তাদের অনেক কথাই ফাঁস করেছে, আর নির্মমভাবে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে গেছে। গেণু দাসের আজ মনে হয় একটা ভুলই করেছিল সে ওই অবিনাশের বৌকে বিশ্বাস

করে। ওরা সকলেই সাপের জাত—সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে, বিষ ভরা ছোবল। ওই সাপের জাতদের সে এক একটা করে শেষ করবে।

...খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রভাতবাবু এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন অন্য কোন স্কুলে চাকরি নিয়ে।

অবিনাশ যতিলালের দলও খবর পেয়ে গেছে। আইনুদ্দি-রামু মোড়লরাও খবরটা পেয়ে চমকে ওঠে। ওরা বলে ঃ

—মাস্টারকে ওই গেণু দাসই তাড়াতে চায় অবা!

অবিনাশও বুঝেছে কারণটা। ওর সাহায্যেই তারা এই দুর্দিন পার হবার মত ভরসা পেয়েছে। বাঁধ বাঁধার কাজ করেছে নিজেরাই। সব রিলিফ সাহায্য এসেছে সোজা তাদের হাতে, আর তার ঠিক ঠিক বিলি ব্যবস্থা হয়েছে। মাঝপথ থেকে উধাও হয়ে যায় নি।

আজ তাই ওরা প্রভাতবাবুকে সরাতে চায়। ওদের উপর চরম আঘাত হানার জন্য।

গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষের কাছে আজ ওদের প্রকৃত স্বরূপটা ফুটে উঠেছে স্পষ্টতররূপে।

টিয়া ভাবনায় পড়েছে।

আজ প্রকাশ্য সভায় চিঠি দিতে গিয়ে ওই কথাগুলো না বলে পারেনি। জানে টিয়া ওরা তার জন্যে তাকেও ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু তার জন্য টিয়া ভয় পায় না।

সবিতা গোছগাছ করছে। টিয়ার কথাগুলো তার এখানেও ভেসে এসেছে। তাই সবিতা বলে—তোর ওসব কথা বলার কি দরকার ছিল?

টিয়া জানায়—যা সত্যি তাই বলেছি। ওসব ঢাকঢাক গুড়গুড় আমার কাছে নাই বাবু। ওদের আমি ডরাই নাকি?

ওই মেয়েটা যেন একলাই গেণু দাসের সব চক্রান্তের মূলে কঠিন আঘাত হানতে চায়।

—এর পর যাবি কোথায় ?

সবিতার প্রশ্নে টিয়া চাইল ওর দিকে।

কথাটা সেও ভেবেছে। কিন্তু তেমন কোন পথের হদিস সে পায়নি। তবু বলে টিয়া :

—জাহান্নমের দোর তো খোলাই আছে দিদি! আর কোথাও ঠাঁই না মেলে সেখানেই গিয়ে হাজির হবো। তার পথ তো জানাই আছে। সিধে পথ।

সবিতা মেয়েটার দিকে চাইল। ওর হাসির অতলে কোথায় একটা তীক্ষ্ণ বেদনার সুর ফুটে ওঠে, সেটাকে টিয়া চাপতে পারেনি। সবিতা কি ভাবছে। মেয়েটার উপর তারও মায়া পড়ে গেছে। সবিতা বলে—আমার সঙ্গে যাবি ওখানের বাংলোয় ?

টিয়া জবাব দিল না। মনে হয় এখানে তবু এ মাটির কাছাকাছি ছিল। অবিনাশকে চোখেও দেখছে, সব খবরই পায় তার। এখান থেকে দূরে চলে যেতে তাই মন মানে না।

টিয়া চুপ করে থাকে।

সবিতা বলে—ভেবে ছাখ তারপর বলিস দুর্গাপুরে যাবি কিনা!

....প্রভাতবাবু অবাক হয় ওদের দেখে। অবিনাশ-রামু মোড়ল-আইনুদ্দি আরও কারা এসেছে রাতের অন্ধকারে। ওদের মুখচোখে ফুটে উঠেছে কি কাঠিন্য।

আইনুদ্দি বলে—তুমি যাবে না মাস্টার। আমরা দশ গ্রামের ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাবো না, ধর্মঘট করবো ইস্কুলে। দেখি ওদের ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গতে পারি কিনা।

অবিনাশও বলে—একবার খেলটা দেখো মাস্টার! তোমাকে সরিয়ে দিয়ে এবার আমাদের দুব্‌লা করে ঘা মারবে। ওদের চালটা বুঝি। তা হতে দিব নাই।

প্রভাত ওদের থামাবার চেষ্টা করে।

—মাথা গরম করো না তোমরা। ইস্কুল বন্ধ করলে ছেলেদেরই ক্ষতি হবে। ওসব পথে যেও না। আর তোমরা যদি এক থাকো—ওদের সব চালই মিথ্যে হয়ে যাবে।

কথাটা ঠিক মানতে চায় না ওরা। অবিনাশ কি ভাবছে। রামু মোড়ল বলে—তোমাকে আটকাতে পারার মুরোদ আমাদের নাই। তবু বলছিলাম কথাটি ভেবে দেখো।

প্রভাত কি ভাবছে।

অসহায় মানুষগুলোর মুখেচোখে কি যেন আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। প্রভাত বলে—সোনামুখীর স্কুলে যদি চাকরি নিই কাছেই তো থাকবো। ওসব পরে ভাবছি—কথা হবে। রাত হয়েছে এখন যাও।

...বাইরে আমগাছের নীচে থমথমে অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। মুঠো মুঠো জোনাকির পুঞ্জ ছিটিয়ে পড়েছে বাতাসে ওড়া আগুনের ফুলকির মত। তারাগুলো মেঘমুক্ত আকাশের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, আবার মেঘে ঢেকে যায় সারা আকাশ।

অবিনাশ শুনেছে কথাগুলো।

প্রভাতবাবুদের জন্য টিয়ার নীরব সেবার খবরও জানে সে। আজ ওই স্কুলের মিটিং-এ গিয়ে টিয়া যে ওদের মুখের উপর যা তা বলে এসেছে তা নিয়ে হাটতলার চায়ের দোকানে তুমুল আলোচনা চলেছে।

নোটন বলে—অবিনাশের বৌ হে—অমনিই তেজীয়ান তো হবেকই। বড়বাবু-ফাবুকে ও পরোয়া করে না।

অবিনাশ প্রথমদিকে যে টিয়ার উপর ভুল ধারণাই করেছিল সেটা আজ পরিষ্কারভাবেই বুঝেছে। মনে হয় সেই অপরাধী, কিন্তু লজ্জায় টিয়ার সামনে আসতে পারে নি। স্কুল বাড়ির সেই সন্ধ্যার ঘটনাটাও মনে পড়ে। অবিনাশ ওই গিরিবালাদের কথায় রেগে ওঠে টিয়াকেও যা তা বলেছিল।

ঠিক চিনতে পারেনি অবিনাশ টিয়াকেও!

ওর বিদ্রোহী নারী মন যে অন্যায়কে সইতে পারে না—কঠিন প্রতিবাদ করে তাই এইটাকেই সে চেনেনি।

সেই নীরব অবহেলাই টিয়াকে আরও অস্থির করে তুলেছিল। অবিনাশ নিজে এগিয়ে এসেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নিজেদের বাঁচার পথ খুঁজে নিতে কিন্তু সেই বন্ধুর পথে নিজের স্ত্রীকেও সে সঙ্গে নেয়নি।

অথচ টিয়া চেয়েছিল স্বামীর পথেই এগোতে এক সঙ্গে। তাই টিয়া অনেক অবিচার অন্যায়কে সহ্য করে নিজের পথেই চলেছে। এখানে অনেক লোভ প্রলোভনকে তুচ্ছ করে সে ওই অত্যাচারী লোভী মানুষগুলোর অন্যায়ের প্রতিবাদই করে চলেছে অন্যপথে, তাদের মুখোসগুলো খুলে ফেলতে চায় সে।

..নীরবে সে তার পথে এগিয়ে চলেছে।

আজ তারা ক'মাস দু'জনে দু'দিকে সরে গেছে। অভিমান ভরেই টিয়া দূরে সরে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে। অবিনাশের কোন সাহায্য না নিয়েই।

ক'টা মাস কেটে গেছে এই মাটিতে। বন্যার পর এই অঞ্চলের বুকে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সব জমি বালিতে ঢাকা, নদীর হানামুখের বাঁধও এরা এখনও দেয়নি। কোনরকমে আটকানো আছে মাত্র, যেন গেণু দাস, কেতুলাল-এর দল এদের সামনে চিরন্তন সর্বনাশের পথটাই মুক্ত করে রাখতে চায়। ওরা বলে - বাঁধ-এর টেণ্ডার হলে কাজ শুরু হবে।

কবে হবে তা এরা জানে না। ওই নিশ্চিত আতঙ্ক সামনে নিয়েই অবিনাশ—পাঁচ গ্রামের মানুষরা আবার বালি সাফ করে চাষ করেছে, কিছু ফসলও করেছে।

এ যেন প্রাণপণ এক সংগ্রাম। ঘরে বাইরে এই কঠিন সংগ্রামে মেতে উঠেছে অবিনাশরা। নিজের দিকে চাইবার সময়ও পায়নি।

আজ শুনছে অবিনাশ টিয়ার কথা, দেখেছে ও তাকে।

টিয়া এতকাল তবু এখানে ছিল, এবার নাকি বড়দিদিমণির সঙ্গে সে এখান থেকে চলে যাবে। অর্থাৎ অবিনাশের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে সে। কথাটা ভাবতে অবিনাশের সারা মন কি বেদনায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

এ আঘাতটা তার কাছে অনেক বড় হয়েই বাজে। টিয়াকেও কথাটা বলার চেষ্টা করেছিল অবিনাশ। কিন্তু দেখেছে টিয়া তাকে দূর থেকে দেখে সরে গেছে। হয়তো এড়িয়ে গেছে।

অবিনাশ বার বার কথাটা ভাবে কি হাহাকার ভরা মন নিয়ে। প্রভাতবাবুও ব্যাপারটা জানে, ওদের জীবনের সব দুঃখ-সুখের খবর তার জানা। আজ যাবার আগে প্রভাতবাবু তাই কথাটা জানাতে চায় অবিনাশকেও।

অবিনাশ চুপ করে কি ভাবছে।

আজ মাঝবর্ষায় তাদের এসেছে একটু অবকাশ। মাঠে এসেছে সবুজ ধানের রাশি, নদীর বানের পলি তবু কিছু আশীর্বাদ রেখে গেছে এ মাটির অণু-পরমাণুতে। তাই আজ সেখানে এসেছে দুনো ফসলের সম্ভাবনা।

অবিনাশ আজ অতীতের কথাগুলো ভাবছে, মনে পড়ে টিয়ার কথা।

প্রভাতবাবুর ওখানে কথা বলে চলে গেছে ওরা সকলেই। অবিনাশ হঠাৎ প্রভাতবাবুর ডাকে থামলো। কি যেন বলতে চায় মাস্টার।

…অবিনাশ আজ ওর কথায় চাইল—তুই ভুল করেছিস অবিনাশ। ভেবেছিলাম নিজেই তোর ভুল বুঝে শুধরে নিবি। কিন্তু তা হয় নি দেখে যাবার মুখে কথাটা বলতে বাধ্য হলাম। টিয়ার উপর অবিচার করেছিস্ তুই।

অবিনাশ জবাব দিল না।

তবু ওর মনের নীরব ব্যাকুলতাটা চাপা থাকেনি। ওর চাহনিতে

তা ফুটে উঠেছে। প্রভাত বলে—ও নাকি সবিতাদির সঙ্গেই ওর বাংলোয় চলে যাবে শুনেছি।

অবিনাশ চুপ করে কথাটা শুনে বের হয়ে এল।

টিয়াও চলে যাচ্ছে এখান থেকে অনেক দূরে। সহরে নোংরার জীবনে যেতে চায়নি টিয়া, সে তাহলে ওই ভাইদের ওখানেই ফিরে যেতো। টিয়া চেয়েছিল একটু শান্তিতে বাঁচতে। তাই আজ দিদিমণির সঙ্গেই চলে যাবে এখান থেকে অভিমান ভরে।

অবিনাশের মনে হয় সবই তার হারিয়ে যাবে।

প্রভাতবাবু চলে যাচ্ছে, টিয়াও অবিনাশকে ছেড়ে যাবে। একা অসহায় একটা মানুষ এই শুকনো কাজ আর বিপদের অন্ধকারে একা পড়ে থাকবে। বাঁচার অর্থটাও হারিয়ে গেছে আজ অবিনাশের কাছে। উঠে আসছে সে।

আবছা অন্ধকারে কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো অবিনাশ। জানে সে ওই যতীন-নিতাই-এর দলকে। তাদের রাজ্যে এসেছে সে, হয়তো অন্ধকারে তারা আজ চরম আঘাতই হানতে চায় তাকে সুবিধায় পেয়ে। অবিনাশের সারা শরীরের পেশীগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে, চোখে ওর জ্বলন্ত দৃষ্টি!

…হঠাৎ চমকে ওঠে অবিনাশ—তুই! টিয়া!

টিয়াও অবাক হয়—তুমি!

টিয়া এসেছিল বাইরে, অবিনাশকে দেখেনি সে।

আজ সবিতাদির কথাগুলো তার সারা মনে একটা প্রশ্ন এনেছে। তার মনের চাপা অভিমানটা কান্না হয়ে ঝরে পড়ে। আজ তার স্বামী-ঘর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সেখানে তার কোন আহ্বান নেই। বিনা দোষে তাকেও নির্বাসিত করেছে অবিনাশ।

আর টিয়াও সেই দণ্ডই মেনে নিয়েছে। সে এখান থেকে চলে যাবে, সবিতাদির ওখানেই চলে যাবে সে।

…অসহায় মেয়েটা কি অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এই অন্ধকারে তার কান্নাটার খবর কেউ রাখবে না।…হঠাৎ সামনে

অবিনাশকে দেখে তাই চমকে উঠেছিল টিয়া। ওকে এখানে এসময় দেখবে তা ভাবেনি।

অবিনাশ এগিয়ে আসে। তার চোখের সামনে তারাজ্বলা অন্ধকারে টিয়ার কান্নাভরা অসহায় রূপটা কি বেদনা আনে তার সারা মনে! অবিনাশ অবাক হয়।

—তুই কাঁদছিস টিয়া?

টিয়া সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—কাঁদবো কেন? কার জন্যে কাঁদবো?

—কালই চলে যাচ্ছিস শুনলাম?

অবিনাশের প্রশ্নে টিয়া নিজেকে চেপে কোনমতে জানায়ঃ

—হ্যাঁ। এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ইখানের সবতো চুকে গেছে, তবে থাকবো কেনে?

টিয়া ফিরে আসছে বাসার দিকে। তার সব দুর্বলতা মুছে গেছে। আজ স্থির কণ্ঠে সে জানিয়েছে অবিনাশকে তার কথাগুলো। কিন্তু মনে হয়েছে এর কোন দামই নেই। মিথ্যা অনেক কিছু হারাবার শোকে সে কাঁদছিল।

—টিয়া!

অবিনাশের সারা মন কি হাহাকারে গুমরে ওঠে।

আজ চোখের সামনে থেকে বাঁচার আশ্বাসটুকু সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। তাই আজ পুরুষের দাবী নিয়েই অবিনাশ এগিয়ে এসে জানায়—তোর যাওয়া হবে না টিয়া। তোকে যেতে আমি দোব না।

টিয়া ওর দিকে চাইল। অবিনাশের এই কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হয়ে উঠেছে। অবিনাশ ওকে কাছে টেনে নেয়। আর বলে ওঠে অবিনাশঃ

—তুই ঘরে ফিরে যাবি টিয়া! নিজের ঘরে—আবার নোতুন করে ঘর বাঁধবো আমরা। এবারের ফসলে আমাদের ঘর ভরে উঠবে—তোকে যেতে দেব নাই রে।

অবিনাশের বলিষ্ঠ দুটো হাতের বাঁধনে টিয়ার সব প্রতিরোধ-

অভিমান কোথায় হারিয়ে গেছে। ওই নিবিড় স্পর্শটুকু টিয়ার শূন্য মনে কি সুর এনেছে। সেই অনুভূতির স্নিগ্ধ গহনে হারিয়ে গেছে টিয়া।

ব্যাপারটা দেখেছে সবিতা।

তারাজ্বলা অন্ধকারে অবিনাশ আর টিয়াকে দেখে আজ মনে মনে খুশী হয়েছে সে। এতদিন মেয়েটা যেন অবিনাশের পথ চেয়েই ছিল। তাকে না আসতে দেখে কি অভিমান ভরেই এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল টিয়া।

সবিতার মনে তৃপ্তির সুর।

বিদ্রোহী কঠিন মেয়েটার মনের অতলে চিরন্তন নারীটিকে দেখেছে সে, যে ভালবাসতে চায়, সব কিছু পেতে চায়।

অন্ধকারে চলে গেল অবিনাশ।

আজ সেও আশা নিয়ে চলেছে। বলে সে—কাল আসবো টিয়া তোকে নিয়ে যেতে।

টিয়া বলে হাল্‌কা স্বরে—কেনে! আমি কি ঘরের পথ চিনি না গ?

অবিনাশ বলে—তবু সাথে করে নিয়ে যাবো রে! একলা কেনে যাবি।

হাসছে টিয়া বিজয়িনীর মত। নিজের ঘরে আবার ফিরবে সে।

...হঠাৎ সবিতাদিকে দেখে একটু চমকে ওঠে। যেন একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সে। সবিতা বলে—কি রে?

টিয়া জানায়—ঘরের মানুষটা এসেছিল গ' দিদি! বলছে—

হাসে সবিতা ওর সলজ্জ ভঙ্গীর দিকে চেয়ে। বলে সে:

—কি বলছে রে? এ্যাঁ—রাতের অন্ধকারে এসে এত কি কথা বলে গেল?

টিয়ার দুচোখে মিষ্টি হাসির আভাস। বলে ওঠে সে—জানি না!

সবিতা ওকে কাছে টেনে নেয়। ভালোবাসার আবেশে স্বপ্নমদির মন নিয়ে দেখছে ওই টিয়াকে। সবিতা বলে:

—ঠিকই বলেছে রে! ঘরের মানুষ ঘরের ঠিকানাই দিতে এসেছিল, তুই যাবি তো রে?

মাথা নাড়ে টিয়া।

সবিতা সকালই চলে যাবে।

গোছগাছ হয়ে গেছে। টিয়ার এতদিনের মাইনে টিয়া নেয়নি। সবিতাই হিসাব করে টাকাগুলো দিয়ে বাড়তি একশো টাকার একখানা নোট দিতে অবাক হয় টিয়া।

—এ মা এত টাকা কিসের গো দিদি!

সবিতার স্বামী এসেছে সকালেই গাড়ি নিয়ে। সবিতা আজ খুশি। এখানের অন্যায়ের কঠিন প্রতিবাদ করেই চলে যাচ্ছে সে। গেণু দাসও এসেছিল। সবিতা শুধু নমস্কার করেই বিদায় করেছে তাকে।

টিয়া দেখছে দিদিমণির সেই মূর্তিটা। শুচিশুভ্র পবিত্র প্রতিবাদ-কঠিন একটি রূপ। ভালো লাগে তার।

টাকার কথায় সবিতা বলে—আমি দিলে নিতে নেই না রে? দিদি বলিস কেন তবে? রাখ টাকাটা।

চুপ করে গেল টিয়া।

এদের যেন নোতুন করে দেখছে সে। ওই গেণু দাস—কেতুলালের সমাজের এরা কেউ নয়। সবিতাদি প্রভাতবাবুরা যেন অন্য এক জাতের লোক।

...প্রণাম করে টিয়া সবিতাকে।

...এখানের পালা শেষ করে এবার ঘরে ফিরছে টিয়া।

অবিনাশ আর সে। নশীপুরের ওই ইস্কুলবাড়ি—বাগান পার হয়ে মাঠে নেমেছে তারা।

অনেক দিন টিয়া এদিকে আসেনি। তখন আসতো এই পথে। ওদিকে বাঁধের হানা মুখে সামান্য বাঁধ মত রয়েছে—তার দু'দিকের উঁচু পাড় বন্যার তোড়ে ধ্বসে পড়েছে, ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আধ-মরা নদীটাকে। বালির পাহাড় ঠেলে এনেছে মাঠে।

ওর মধ্যে বালি সরিয়ে তারা চাষ করেছে কিছু জমিতে। সবুজ ধানগাছগুলো আবার মাথা তুলেছে তাদের গ্রামসীমা অবধি। আখের সবুজ ক্ষেতে বাতাসের কাঁপন লাগে, ঝিঙেফুলগুলো পড়ন্ত বেলায় হলুদ বিন্দুর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ঝক-ঝক করছে।

গ্রামের মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো টিয়া।

এ যেন তার ফেলে যাওয়া সেই সমৃদ্ধ গ্রাম নয়। মাটির কোঠা বাড়িগুলো বানের তোড়ে ধ্বসে পড়েছে। সেই ঢিবির উপর কোনরকমে একচালা—দোচালা তুলে বাস করছে মানুষ। তবু সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে, শঙ্খ বাজে।

টিয়া নিজের ভিটেয় এসে দুহাত তুলে প্রণাম জানায়।

এতদিন নশীপুরের ওই প্রাচুর্য আর বিচিত্র মানুষগুলোর সমাজে বাস করেছে সে। দেখেছে শুধু তাদের লোভ লালসা। ও যেন অন্য জগৎ।

এখানের ঘরটুকুকে তাই সেই জ্বালাভরা মন নিয়ে নয়, অনেক শান্তির সন্ধান করা দৃষ্টি দিয়ে দেখছে সে।

ভালো লাগে টিয়ার।

—এয়েছিস অবা! অ বৌ এলি বাছা?

ওদিকের বেড়ার ঘরগুলো থেকে কারা এগিয়ে আসে। মতিলালের বৌ বলে—ধন্যি মেয়ে যাহোক! এবার নিজের ঘর বুঝে নে। মানুষটাকে আর দগ্ধে মারিস না। নিজেও দুঃখ কম পাসনি।

হাসে টিয়া—তাই তো এলাম এই মাটিতে।

বুড়ি গিরিবালা চোখে ভালো দেখতে পায় না। তবু এদের সাড়া পেয়ে সেও এসেছে। গিরিবালা বলে:

—এলি তালে! জানতাম লা। আসতেই হবেক। টিকি যতই মাথা নাড়ুক গড়ে আসতেই হবেক তাকে। ইবার দেখে শুনে লে। আর অবা? সে মুখপোড়া কইরে?

অবিনাশ সাড়া দেয়—এই তো রইছি গ পিসী!

বুড়ি বলে—আর তোকেও বলি অবা, সবইতো গেল। ঘরের

খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেচারা মেয়েটাকে আর হেনস্থা করিস্ না। ওটাকে এবার শান্তি দে। কাজ কাম ছাখ! মেয়েটাকে আর তাড়াস নি।

এ যেন অন্য গিরিবালা।

ওরাও ওই জীবনকে অনেক দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করে এসেছে ক'দিন আশ্রয় নিতে গিয়ে। তাই টিয়ার জন্য তারা বেদনা বোধ করে।

টিয়া আজ অনেক মূল্য দিয়ে এই ঘরের, এ মাটির মর্যাদা বুঝেছে। চিনেছে এই মানুষগুলোকে। টিয়ার মনে হয় এ মাটি অনেক শুচিস্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ মাটির নীরব আশীর্বাদ তার মনের জ্বালাকে যেন কমিয়ে দিয়েছে।

টিয়া বলে—ইখানেই থাকবো পিসী। ইখানেই তো আমার সব গো।

রাত্রি নামে।

স্তব্ধ আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। কোথায় রাত-জাগা একটা পাখী বার কয়েক ডেকে ডেকে থেমে গেল।

—টিয়া!

টিয়া চাইল অবিনাশের দিকে।

ওর দুটো বলিষ্ঠ হাতের বাঁধন টিয়াকে কি কঠিন মায়াভরে জড়িয়েছে। টিয়া বিচিত্র একটি স্বপ্ন-জগতের অসীমে হারিয়ে যায়।

টিয়া বলে—আবার ঘরটা বানাও গ। ট্যাকা আমি দিব।

অবিনাশ দেখছে ওকে—আবার ঘর বানাবি!

—কেনে বানাবো নাই!

টিয়া ঘরের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত করতে চায়।

টিয়া ঘরের স্বপ্ন দেখে, ধানের মঞ্জরীগুলো বাতাসে দোল খায়।

টিয়াও এই মাটিকে নোতুন করে চিনেছে। আদিগন্ত সবুজের বুকে আসছে সোনালী হলুদ আভা। অবিনাশ অবাক হয়।

—তুই মাঠে এসেছিস টিয়া ?

দিন থেকে মাঠে জলের তদারক করতে হয়। আমন ধানের গলা ফেটে থোড় বের হচ্ছে, আউশের মঞ্জরীতে এসেছে সোনা রং—মাঠের জলজমা বুক থেকে রোদের তাপে উত্তাপের আবেশ ওঠে। মাঠে মাঠে সোনা ধানের আশ্বাস, নোতুন করে বাঁচার আশ্বাস ওদের সারা মনে।

টিয়া বলে—কেন আসবো নাই।

অবিনাশের বুকে এসেছে নোতুন আশা। এ লপ্তে দশ বিঘা জমিতে পুরুষ্ট আউশের ধানে সোনা রং ধরছে। ওদের সব অভাব ঘুচে যাবে—গ্রামের মানুষের বহু কষ্টের দিন—বহু উপবাসের বেদনার্ত স্মৃতি ছাপিয়ে এসেছে সোনালী আশ্বাস।

যতিলাল বলে—ইবার আউশের ফলন দেখেছিস অবা ? আউস তুলেই বতরে চাষ দিই আলু বুনবো—চক্‌কে চক আলুর ক্ষেত করে দে।

…ওরা আশ্বাস পেয়েছে এবার।

হঠাৎ ঈষাণ কোণে কোথায় মেঘের সঞ্চার হয়েছিল এরা ভাবতে পারে নি। খেয়াল করে নি। সেই মেঘটাই তাদের আকাশকে গ্রাস করে সব আলোর দীপ্তিটুকুকে মুছে দিয়েছে। এসেছে সর্বনাশা ঝড় !

·· দুপুরে হঠাৎ গ্রামে সোরগোল পড়ে যায়। আর্তকণ্ঠে কারা চীৎকার করছে। কলরব ওঠে। গিরিবালা পঞ্চমে গলা তুলে চীৎকার করে—সর্বস্ব লুটে লিলেক র‍্যা! অরে অ আবাগীর ব্যাটারা—

…গ্রামের মানুষগুলো লাফ দিয়ে ওঠে। কেউ খেতে বসেছিল —কেউ ঘরে কাজে ব্যস্ত, মেয়েরাও বের হয়ে আসে। সারা গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। লাঠি-টাঙ্গনা-গাইতি-সড়কি যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই কাজলা নদীর ধারের দো-ফসলা জমির দিকে ছুটছে।

…গেনু দাস হিসেবে ভুল করেনি। ও জানে কখন কোন দিক থেকে ঘা-মারতে হবে। তার এতদিনের চাপা আক্রোশ আর জ্বালাটা যেন কঠিন দস্যুর মূর্তি নিয়ে আজ হাজির হয়েছে।

ওপারের দিক থেকে এনেছে গোটা পঞ্চাশেক গরুর গাড়ি—শতখানেক লাঠিয়াল—আর যতীন নিতাইও এসেছে আজ তৈরী হয়ে। ওদের সোনা ধান লুঠ করে নেবে গেণু দাস।

গেণু দাসের লোকগুলো মাঠে নেমে আধপাকা ধান-এর মঞ্জরীগুলো কাটছে। তছনছ করছে ওদের সারা বছরের পরিশ্রম স্বপ্ন—বাঁচার আশ্বাস। লুঠেরার দলের নিয়ম, যে যত জমির ধান কাটবে—তার সে ধান। তাই লুঠ করার লোকের অভাব হয়নি।

নিতাই যতীন লাঠিয়ালের দল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে তাদের। গর্জন করে নিতাই চাষীদের উদ্দেশ্যে :

—কেউ এগোলে লাশ দাখিল হয়ে যাবেক। এগিয়ে আয় কে বাপের ব্যাটা আছিস! লোকগুলো মত্ত উল্লাসে চীৎকার করে :

কোন বাধা না পেয়ে ওরা নিজেদের দখলই যেন কায়েম করে ফেলেছে এবার ধান কেটে।

উঁচু পঘারের ওদিকে নজর যায় না। মনের আনন্দে লুঠেরার দল ধান কেটে চলেছে, হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে ওদিক থেকে জেগে উঠেছে অনেকগুলো প্রতিবাদ-কঠিন মুখ—তাদের জ্বলন্ত চোখের চাহনি।

ওরা সামনে থেকে আসেনি, দূরে দাঁড়িয়েছিল এদিকের কিছু লোকজন, অবিনাশ-যতিলাল-নকড়ি-রামু মোড়লের দলবল নদীর বাঁধে নেমে আড়াল দিয়ে এসে এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে এদের উপর।

অবিনাশ-এর দলবল, এ গ্রামের চাষীরা সামনা-সামনি আক্রমণ না করে অতর্কিতে বাঁধের পিছন দিক থেকে এসে গেনু দাসের লুটেরার দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আর অন্য দিক থেকে এসে বাধা দিয়েছে আইনুদ্দি ভূপেনের দল, এই গ্রামের চাষীরা। এবার লুটেরার দল ছিটকে পড়েছে তাদের লাঠির সামনে। পালাচ্ছে ওরা যে যেদিকে পারছে কিন্তু বেড়াজালে

যেন ঘিরে ফেলেছে এরা। ওই দস্যুদের জয়ধ্বনি এবার আর্তনাদে পরিণত হয়।

পিছনে উদ্যত মুষ্টির অতর্কিত আক্রমণে এরা চমকে উঠেছে। কয়েকটা বলিষ্ঠ লাঠির আঘাতে ছিটকে পড়ে দু-তিনজন সর্দার, যতীন দৌড়চ্ছে—তার পায়ের উপর সজোরে লাঠিটা এসে পড়তে ছিটকে পড়ে যতীন।

আর্তনাদ করে সে।

আজ ওরা যেন ক্ষেপে গেছে। ওই পুঞ্জ সোনা ধানের ক্ষেতের উপর আজ ওরা তাদের অধিকার নিয়ে—বাঁচার অধিকার নিয়ে এগিয়ে এসেছে। লোভী লুঠেরার দল দৌড়চ্ছে এদিক-ওদিকে। কারা ওদের গাড়ি থেকে গরুগুলো খুলে দিতে তারাও লেজ তুলে গ্রামের দিকে দৌড়চ্ছে—মাঠে একটা ঝড় বয়ে চলেছে।

ওই দস্যুর দলের পালাবার পথ নেই—সারা সবুজ ক্ষেতের এদিক ওদিকে জেগে উঠেছে সজাগ প্রহরীর দল। প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে ওরা—ওদের লুঠ করার সখ মিটে গেছে।

·· গেনু দাস দূরে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল তার প্রতিষ্ঠার দাপট। আজ ওই অসহায় মানুষগুলোর হয়ে কথা বলার কেউ নেই। সব জমি আসবে তার খাস দখলে, আর বর্গাদারীর নাম মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠবে তার নাম, শ্রীজ্ঞানদাস দিগর। পকলিকার।

কিন্তু হঠাৎ সারা দিগন্ত কাঁপিয়ে শান্ত মাটির বুক থেকে এত দিনের পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ ফেটে পড়েছে আদিম হিংস্রতার কাঠিন্যে।

গেনু দাস বিস্মিত চাহনিতে চেয়ে দেখছে। কিসের সাড়া উঠতে সেও অবাক হয়ে যায়। ওই শীর্ণ মানুষগুলোই আজ প্রতিরোধ গড়েছে। পালাচ্ছে ভীত-ত্রস্ত লুঠেরার দল—ওরা এগিয়ে আসছে। কার হাতের উদ্যত টাঙ্গি রোদে ঝক্‌ঝক্ করছে।

—পালান বড়বাবু! পালান!

নিতাই দৌড়ে আসছে তাড়া খেয়ে, ওর দুচোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত।

গেনু দাসও দৌড়চ্ছে—দম বন্ধ হয়ে আসে, বুকটা যেন ফেটে পড়বে। পিছনে শোনা যায় কাদের চীৎকার। ওরা এগিয়ে আসছে। আকাশ কাঁপানো চীৎকার।

হঠাৎ নোতুন উঁচু বাঁধের উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেনু দাস—কোথায় হোঁচট খেয়ে ঘুরে পড়েছে। দাঁড়াবার সাধ্য নেই—তার ভারি দেহটা গড়াচ্ছে, আর্ত চীৎকার করে ওঠে গেণু দাস—নীচে দেখা যায় ভরা আশ্বিনের কাজলা নদীর জল স্রোতের আবর্তে যেন মৃত্যুর অট্টহাসি নিয়ে বয়ে চলেছে।

…চীৎকার করছে গেনু দাস—মনে হয় জীবনভোর এত হিসাব-নিকেশ সব মিথ্যে। এতবড় দাবার চালের একটা ভুলে তার রাজা-পদের কিস্তিমাত হয়ে গেল।

নদীর দিকে গড়িয়ে পড়ছে গেনু দাস, তখনও তার ক্ষীণ চীৎকার ভেসে ওঠে—বাঁচাও।

ওই হাজারো মানুষও এমনি কাতর আর্তনাদ করে এসেছে এতদিন। গেণু দাস্‌রা তাতে কর্ণপাত করেনি। আজ তার একক ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও কারো কানে পৌঁছে না।

কালস্রোতের আবর্তে তলিয়ে গেল গেনু দাস দিগর ওই প্রবহমান নদীর অতলে।